অন্বেষা

পূজা সংকলন

১৪৩২

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

অন্বেষা

পূজা সংকলন
১৪৩২

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ষাণ্মাসিক ডিজিটাল পত্রিকা

সম্পাদনা

সুধাংশু শেখর পাল ও অশোক বিশ্বাস

প্রকাশক

এরিকেয়ার

কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের সংগঠন

সি – ৪৩, নিউ গড়িয়া ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, কলকাতা - ৭০০০৯৪

ওয়েবসাইট: http://aricare.in/index.php

ইমেইল: aricarekolkata@gmail.com; info@aricare.in

দূরাভাষ: +৯১৯৪৩২২০৯৮৫, ৯৮৩০০৪৪১১০, ৯৪৩২০১২৪৬৬

মুদ্রক: মৌসুমী মুখার্জী

সূচিপত্র

কবিতা

মুক্তি সাধন বসু, বংশী মন্ডল, সুফল সাহা, সুধাংশু শেখর পাল ৫ - ১০

গল্প

গৌতম রায়, চৈতালি দত্ত ১১ – ১৬

প্রবন্ধ

উৎপলা পার্থসারথি, কৃষ্ণা পাল, অশোক বিশ্বাস ১৭ - ৩৩

বিজ্ঞান

কৃষ্ণেন্দু দাস, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, *সমীর কুমার বারারি* ৩৪ - ৪১

স্মৃতিকথা

মধুমিতা দাস ৪৩ - ৪৫

অঙ্কন

কৃষ্ণা পাল, দেবাঞ্জন সুর ৪৬ - ৪৭

ভ্রমণ কাহিনী

কৃষ্ণ কিশোর শতপথী, দিলীপ কুমার কুন্ডু, মৃন্ময় দত্ত ও রিনা দত্ত, বিনয় কুমার সাহা,

সজল কুমার চট্টোপাধ্যায় ৫০ - ৭৯

সম্পাদকীয়

মহাকালের অমোঘ নিয়মে ব্যতীত হয় মানুষের জীবন প্রবাহ। এই প্রবাহে আছে সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না, জয়-পরাজয়, পাওয়া- না পাওয়ার বেদনা, আছে নানা বিপরীতধর্মী অনুভূতি বুকে বয়ে নিয়ে চলা। আছে দিনযাপনের গ্লানি, আছে হতাশা নৈরাজ্যের নিকষ কালো অন্ধকার থেকে মুক্ত হবার আকুলি-বিকুলি। গতানুগতিক জীবনের খোলস ছেড়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় মন কোন এক অচিনপুরে, সেখানে আছে শুধু আনন্দ, আছে এক মাদকতা, আছে সাজে -সিঙ্গারে নিজেকে প্রকাশ করার অবাধ স্বাধীনতা । একা নয়, যুথবদ্ধভাবে আমরা ও আমাদের চারপাশে যারা আছেন, তাদের সঙ্গে আনন্দ ও উদ্দীপনা বেঁটে নিই, আর এই সমস্ত সুপ্ত অনুভূতিগুলিকে বাস্তবায়িত করতে আমাদের জীবনে, সমাজে ও সংস্কৃতিতে কবে কোন মাহেন্দ্রক্ষনে "উৎসব" নামক সঞ্জীবনী বটিকার উদ্ভব হয়েছে, তা বলা কঠিন। প্রয়োজনের দিক থেকে দেখতে গেলে উৎসব সামাজিক, ধর্মীয়, কৃষি অথবা শিল্প ভিত্তিক, কিম্বা রাষ্ট্রীয়, যেখানে পুরো দেশের আপামর জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে, নানা রূপে পালিত হয়।

বর্ষা বিদায়ের সাথে শরৎ ঋতুর শুভাগমন। প্রকৃতি নবরূপে সজ্জিতা হতে চলেছেন। নীলাকাশে শুভ্র মেঘের আনাগোনা, কখনো বা রোদ্রচ্ছায়ার মায়াবী খেলা। উন্মুক্ত প্রান্তরে কাশফুলের উপর দিয়ে বয়ে চলা মাতাল হাওয়া, শিউলি ফুলের সুমধুর গন্ধে মাতোয়ারা মন। প্রকৃতি যেন নিত্যনূতন নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত, আর মাতৃরূপে নিজেকে প্রস্তুত করছেন সন্তানদের সুখ-সমৃদ্ধি এবং ঈশ্বরিক শান্তি কামনায় ।

শারদীয়া দুর্গোৎসব বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। আপামর বাঙালির কাছে এই পূজা, চিরায়ত ঐতিহ্য ও ধর্মীয় সংস্কৃতির মেলবন্ধনে এক প্রীতিময় আনন্দ উৎসব। অশুভ ও অপশক্তির পরাজয় ও শুভ শক্তির জয়, সত্য ও সুন্দরের আরাধনায়, সর্বজীবের মঙ্গল সাধনই দুর্গোৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অশুভ ও আসুরিক শক্তি দমনের মাধ্যমে সমাজে সত্য, ন্যায় ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা,বৈষম্য, অন্যায় ও অবিচার দূরীকরণ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও মানবতাবাদে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই দুর্গোৎসবের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ।

বর্তমানে পুরো বিশ্ব জুড়ে চলেছে চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা। আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত কারণে কমবেশি বিশ্বের সব রাষ্ট্রই প্রভাবিত। অনেক দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান হ্রাস হওয়া, বৈশ্বিক বাণিজ্যের শর্তাবলীর পরিবর্তন, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনৈতিক হস্তক্ষেপ, ধর্মীয় মেরুকরণ, রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা দুর্বল ও আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর দেশগুলিকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।

অধুনা পশ্চিমবাংলার বাহিরে কিছু রাজ্যে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সমাজের প্রতি অবমাননা সত্যি চিন্তার বিষয়। এর ওপর আছে প্রকৃত নেতৃত্ব ও সুশাসনের অভাব। সব মিলিয়ে এক চরম পরিস্থিতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের বুনিয়াদি সুবিধাগুলি সাধারণ মানুষের কাছে অলীক কল্পনা মাত্র । শিল্প বাণিজ্যের হাল তথৈবচ।বন্ধু - অবন্ধু - মানব - জীবজগৎ - ত্রিভুবনের যাবতীয় যোগের মধ্যে জীবনের মূল সুরটি বাঁধা - এই বহুত্ববাদ, বহুযোগে। সেই সংযোগের আয়োজনে জেগে উঠুক শারদোৎসব।

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রচেষ্টার এই সাহিত্য উপাচার এই বছর পাঁচ বছর সম্পূর্ণ করল। প্রতিবছরের মতো এই বছরও সংগঠনের সদস্য ও সদস্যারা বিভিন্ন ধরনের লেখা দিয়ে এই স্মারক সংকলন প্রকাশে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন লেখক লেখিকা বিজ্ঞাপন দাতা ও পাঠকদের সংগঠনের তরফ থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সম্পাদকমন্ডলী

কবিতা

ভারত দেশ

মুক্তি সাধন বসু

ভারতবর্ষ এক দেশের নাম,

কৃষিকর্মের আর এক নাম;

হল-বলরাম, রাজা জনকের নাম,

মাটিতে জন্ম এক মায়ের নাম;

আমাদের অন্নদাতা কৃষকের নাম।

এ কৃষক পৃথিবীর প্রথম মানুষ,

সেদিন সে বীজ পুঁতেছিল;

একরাশ শষ্যের সম্ভবনা নিয়ে।

ভরে দিয়ে মাটিতে মাতৃত্ব,

ইতিহাসে কৃষকের প্রথম নবান্ন।

খবরে প্রকাশ

সেই তার নবান্নের শেষ অন্ন,

এর পর দিকে দিকে দারুন সংগ্রাম;

বাঁচার লড়াই বিরামহীন রাত্রি দিন,

শাসনে, শোষনে, পোষনে, কুপোষনে

রোগে ভুগে অস্থি চর্ম সার।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

অনাবৃষ্টির শেষে সক্রিয় মৌসমী বায়ু,

অতিবৃষ্টি, ফসলের পোড়া মুখ ভাসে,

কৃষকের, মজুরের শিরে সর্পাঘাত!

লখিন্দরের শব ভাসে সহস্র হাজার,

হাবুডুবু মানুষে, পশুতে, আর মনুষ্যত্বে ।

ডারউইন বিস্ফারিত চোখে –

তত্ত্ব তার মূল্যহীন ভারতের কৃষকের কাছে।

আমার কোনো কাহিনী নেই

বংশী মন্ডল

আমার রাজ্যে আমি রাজা, ছত্রিশ ইঞ্চির হকদার,
রাজ্য মানে মন, থাকে উত্তুরে, সদাই বিদ্রোহী কবিতা
আমি থাকি আমার রাজে, বিজন মনে, আপন আবাসনে;
অন্দর আমার তেজোময়, আয়ুস্কালের বৃন্দাবন,
সত্য অসত্যের চিন্তনে, অরুপ রসের প্রাণ পুরুষ।

মালা তুলসী নেই, চন্দন তিলক নেই,
মানব আমি প্রাচীন, এখন সনাতনী নবীন,
আমি আমার আদর্শের অগ্রদূত, আমার নেই কোনো কাহিনী
যাত্রা পথে আমি খণ্ডকাল, আমি মহাকাল।

হাড় মাংসের খাঁচায় দেহগুণে আমি বাদশা,
মিথ্যার জটিলে কুটিলে আমি সব সমস্যার সমাধান।
পাপ পুণ্যি বুঝি না, বেহিসাবী যা কিছু লজ্জা, মান ভয়,
সব সঙ্গ দোষে অর্জন,পাই নি কোনো সাধু সঙ্গ মন,
সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা গলায় দড়ি দিয়ে হলো আত্মঘাতী,
বাস্তবতার দিগবলয়ে, এখন বুঝি সত্য বড়ই একা।

সিংহাসন

সুফল সাহা

ভগবান তুমি এসো ফিরে -
তুলে নাও হাতে চাবুক।
এই দেশ যে আজ টলছে নেশায়,
লুটিয়ে গিয়েছে স্বদেশ সুখ।।

মন্দির- মসজিদ- গির্জা –দরগা-
রাজনীতি আজ ধার্মিক ।
গরীবের মুখে জুটছে লাথি,
স্বাধীনতা আজ অস্বাভাবিক।।

জ্বলছে বাংলা পুড়ছে দিল্লি -
শিক্ষা করছে ভিক্ষা ।
প্রাণগুলো আজ করছে কেবল,
বিক্ষোভ আর বিচারের অপেক্ষা।।

রক্তে রক্তে বাড়ছে বিভেদ-
চোখ রাঙাচ্ছে নির্যাতন ।
প্রশ্ন যখন আমার আপনার,
প্রশাসন কেবল প্রহসন ।।

প্রতিশ্রুতির রাজনীতি শুধু-
নেই যে কোনও বাস্তবায়ন ।
দলে দলে শুধু বাড়ছে লড়াই,
লক্ষ্য কেবল সিংহাসন।।

Love in a terrible night

Sudhansu Sekhar Pal

It was a dark night, I remember,
Terrible in some early September;
Pearcing the heart in chilled wind
To break even the strongest mind.

Very romantic the night it was
So fantastic but lonely one alas!
Silence and silence everywhere
Except the murmuring sound of wind
And angry waves of various kind
While siting on an infamous ferryghal,
To sail a boat for reaching the other part.

Alone I was amidst furry of nature,
Fortunate, unfortunate or helpless,
To enjoy its terrible beauty;
Closing my eyes, in sheer anxiety
I could feel my speeding pulsation,
Being deeper and deeper for an unknown fear,
Adventure, romance or a fantacy!

Suddenly, I felt someone standing,
Close to me, bad beyond identifying,
In the inky-black darkness.
Man or woman, who is waiting like me,
It may be luck or luck in disquice;
To accompany me for a terrible journey
For reaching the physical or ultimate destination.

A loud human voice broke my silence,
Small, a boat came from other side.
The boatman reaching the shore,
Shouted in style, anyone to ride?
We, the only two, embarked the boat,
Sitting opposite to each other
Still enjoying the beauty of nature!
I couldn't remember rather,
We were speechless altogether,

A sudden thunderbolt and lightening,
And we embraced each other
For protection, or out of fear!
How long, we were locked in embrace
I don't know, but felt who the stranger is.

Knowing or unknordingly,
We didn't want to be separate
Might be, the situation made us desperate,
Or a momentory pleasure,
In search of a hidden treasure?

I was in my early twenth,
Perhaps feeling the warmth
And smell of the drenched body
Or some esthetic feelings;-
A shower of boon from heaven!
Or being perplexed and speechless.
A situation nothing but abruptness!

How old she might be?
Is she a damsel?
Ended all suspicions within me
With one more powerful lightening,
The beautiful face redened in shame
Appeared like a moon, brightening,
Senced the farm, hot and soft sensation
Of the cowarded dove taken shelter,
On my chest, the assured divine dwelling.
A long cherished desire, of every young heart.

Still we were locked in embrace
Probably in sheer delight-
Suddenly, once again a splash of light
I saw love once again,
Was it a love on first sight?
Or a string of primitive instinct?
Who to answer me or my inner conscience?

Went on the time and tide,
Till the furry of nature passified
So also my impetuosity of restless mind.
A mysterious game of light and darkness,
In the sky above and its reflexation below,
The water so restless, but in sheer control,
Saddled my heart for proximate separatoion,
Oh, how cruel is the creation!
The boat reached the shore in time,
How can I say goodbye to her,
But a sparkling smile!

গল্প

প্রিয় মামমাম

গৌতম রায়

প্রিয় মামমাম,

তুমি হয়তো আমার এই চিঠিটা পেয়ে একেবারে অবাক হয়ে যাবে! ভাববে – এইতো দুদিন হল আমায় তুমি পৌঁছে দিয়ে গেলে। এখনই আবার কি দরকার পড়লো তোমায় চিঠি লেখার! আর তাছাড়া এই চিঠি লেখা ব্যাপারটাই বা কেন? রোজ তো আমাদের দু–তিনবার ফোনেই কথা হয়, তাহলে আবার এই চিঠি লেখা কেন! আর সত্যি বলতে কি তোমায় তো আমি এর আগে কোনদিনই কোনো চিঠি লিখিনি। আসলে লেখার কোনদিন কোন প্রয়োজনই পড়েনি। আমি দেখেছি, আমি যা কিছু তোমায় বলবো ভাবি, তুমি যেন কি করে সেটা নিজের থেকেই জেনে ফেলো আগে থেকে। কি? তাই না?

কিন্তু মামমাম তুমি জানোনা, আমার বুকের ভেতর অনেক কথা জমে আছে গো, যা হয়তো তুমি ভাবতেও পারবেনা। সেগুলো এমন কিছু কথা – যেগুলো আমি ঠিক মতো তোমার সামনে সামনি কোনোদিন হয়তো বলতেও পারবোনা সেভাবে। সেসব কথা বলতে গেলেই কিরকম যেন গলাটা ভেতর থেকে ভারী হয়ে আসে। আর বলা হয়ে ওঠে না। বলতে তোমায় পারিওনি কোনোদিন! চেষ্টা করেও পারিনি। তাই এবারে যখন পুজোর ছুটিতে তুমি আমায় বাড়ি নিয়ে গেলে, আমি ভেবেছিলাম একদিন ঠিক কথা গুলো বলবো তোমায়। কিন্তু দেখো, আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পারলাম না সেসব কথা তোমার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করতে। আর তাই ছুটি থেকে ফিরে আসার পর মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে তোমায় চিঠি লিখতে বসলাম আজ।

মামমাম, প্রত্যেকবার যখনই আমায় তুমি এই কার্শিয়াং-এ আমার বোর্ডিং এ পৌঁছে দিতে আসো, ফেরার সময় তোমার চোখে জল দেখতে পাই। বুঝি- তুমি কাঁদছো। বেশ কয়েক মাস আমায় না দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনায়, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য না পাওয়ার সম্ভাবনায় তুমি কাঁদো। সেই কান্না লুকোতে চাইলেও আমি কিন্তু ঠিকই বুঝি। তুমি প্রাণপণ চেষ্টা করো আমার সামনে চোখের জল না ফেলতে, আমার সামনে নিজেকে শক্ত এবং স্বাভাবিক রাখতে! আমার সামনে চেষ্টা করো যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকতে। আবার যখন পুজোর ছুটিতে বা অন্য কোনো ছুটিতে আমায় বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য আসো, তোমার চোখ মুখ একবারে ঝলমল করে - আমায় অন্তত কিছুদিনের জন্য নিজের কাছে রাখার আনন্দে। আমি সব বুঝতে পারি মামমাম। ছোটো থেকে এতো কিছু চোখের সামনে দেখেছি, শুনেছি যে আমি সময়ের আগেই একটু বেশি বড় হয়ে গেছি মামমাম। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটাও বুঝে গেছি যে, নিজের দুঃখ শুধুমাত্র নিজেরই। অন্য কেউ সেই দুঃখের গুরুত্ব কিছুতেই বুঝতে পারবে না। বরং আমার যেটা ভীষণ দুঃখের জায়গা, কষ্টের জায়গা, বুকের ভেতর যেখানে একটা দগদগে ঘা লুকিয়ে আছে, সেটা যদি কারোর কাছে উন্মুক্ত করি, সে কিছুতেই আমার সেই দুঃখের, সেই হাহাকারের গুরুত্ব ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারবে না। তাই নিজের দুঃখ নিজের কাছেই রেখে দেওয়া ভালো গো! আমি তাই আমার সেই গোপন দুঃখের কথা কাউকে কখনো বলিও না কোনদিন।কাউকে বুঝতেও দিইনা। এমনকি তোমাকেও সে সব কথা খোলাখুলি জানাবো কিনা ভাবতে গিয়ে অনেকবার ভেবেছি যে তুমি আবার আমার এই গোপন কষ্টের কথা শুনে যদি তুমি আবার নিজেকেই তার জন্য দোষী ভাবো, তাই বলিনি তোমায়।

বিশ্বাস করো মামমাম, তুমি যা করেছ, যা সিদ্ধান্ত নিয়েছ - তা একেবারেই সঠিক ছিল। একেবারে ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তুমি। আর শুধু যে সিদ্ধান্ত নিয়েছ – তা তো নয়, সেই সিদ্ধান্তকে সদা জাগ্রত রাখতে – কি অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছ তুমি দিনরাত। হসপিটালে সারাদিন নার্সিং এর কাজ করে ছুটির পরে আবার একটা নার্সিংহোমে বেশিরভাগ দিন নাইট ডিউটি করো। আমি জানি, বুঝি। আমায় একটা সাধারন বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়ালে কোনোদিনও তোমার এত টাকার দরকার হতো না। তুমি এই কঠিন পরিশ্রম করে সারা মাসে যা উপার্জন করো, তার প্রায় সবটাই এই কার্সিয়ং–এর এই বোর্ডিং স্কুলে আমার জন্য খরচ হয়ে যায়। এই একটা কারণেই নিজেকে আবার ভীষণ দোষী মনে হয়। মনে হয়- কি দরকার ছিল তোমার আমায় এত ভালো স্কুলে এইভাবে পড়াবার! বাংলা মিডিয়ামের পাড়ার স্কুলে কি আর একেবারেই পড়াশোনা হয় না? নাকি কেউ ওখান থেকে পড়ে মানুষ হয় না? আমি জানি এর আসল উত্তরটা! তুমি আসলে বাবার উপর চ্যালেঞ্জ করে একার উপর সবটুকু দায়িত্ব তুলে নিয়ে, তোমাদের মিলিত স্বপ্নকে এগিয়ে নিয়ে চলেছো! আমি জানি – বাবা চাইতো – তার মেয়ে, সবচেয়ে আদরের একমাত্র মেয়ে – সবচেয়ে ভালো স্কুলে সবচেয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে! তুমি তখন আপত্তি জানিয়েছিলে, আমার মনে আছে।বলেছিলে “আমাদের একমাত্র মেয়ে কেন আমাদের ছেড়ে অতোদূরে থাকবে? রোজ বাড়ি ফিরে ওকে দেখতে পাবো না, ওকে নিজের হাতে চান করিয়ে দিতে, খাইয়ে দিতে, সাজিয়ে দিতে পারব না! তাছাড়া ওরকম একটা নামকরা স্কুলে পড়ানোর তো খরচও বিশাল! যদিও তোমার ব্যবসা আছে, আমার হসপিটালের চাকরি আছে।দুজনে কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারব, কিন্তু কি দরকার? বাংলা মিডিয়াম স্কুলে না হয় নাই বা ভর্তি হলো, কাছাকাছি কোনো ইংলিশ মিডিয়ামে স্কুলেই তো ভর্তি হতে পারে”! কিন্তু বাবা একেবারেই খেপে উঠেছিল আমায় এখানে ভর্তি করার জন্য! সত্যি বলছি মামমাম আমি খুব দুঃখ পেয়েছিলাম সেই সময়। তোমাদের ছেড়ে থাকতে হবে বলে লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাঁদতাম তখন। কিন্তু জানো, পরে ভেবে দেখেছি- এটা একদিকে বেশ ভালোই হয়েছে। বাড়িতে যখন রোজ তোমাদের চিৎকার চেঁচামেচি হত – ভীষণ ভয় পেতাম আমি, মামমাম। একটা ভীষণ রকমের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতাম তখন আমি। বাবা যখন ওরকম চিৎকার করতো, জিনিসপত্র ছোঁড়াছুড়ি করতো, এমনকি তোমার গায়ে হাতও তুলতো যখন, আমি ভয়ে আতঙ্কে কাঁদতেও ভুলে যেতাম। ভাবতাম তোমরা দুজনে এরকম ঝগড়াঝাটি করে দুজনেই যদি দুদিকে চলে যাও কোনোদিন, তখন কোথায় থাকবো আমি?

মামমাম – ঠিক করে বলতো – বাবা কি সত্যিই আমায় ভালোবাসতো কোনদিন? আমাদের কি ভালবেসে ছিল কোনোদিন? আমি তো এখনো একেবারেই ভাবতে পারি না যে কি করে বাবা তোমাদের ডিভোর্স এর কাগজে পরিষ্কার করে লিখে দিল যে একমাত্র মেয়ের সঙ্গেও কোনোদিন কোনো সম্পর্ক রাখবে না, এমনকি কোনদিন আমার মুখও দেখবে না! কি করে এটা করতে পারলো বাবা? আমি কি সত্যিই ওর মেয়ে নই? তোমার সাথে রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটি করে না হয় তোমায় ডিভোর্স করে দিল, কিন্তু আমি কি দোষ করেছিলাম বলো তো? অথচ খুব ছোটবেলার কথা যেটুকু মনে পড়ে – বাবা তো তখন আমায় কত আদর করতো, বেড়াতে নিয়ে যেত, তার আদরের মামবুড়ি কিভাবে বড়ো হবে, বড়ো হয়ে কিভাবে কি করবে – এসব নিয়ে কতো আলোচনা করতো! তাহলে? তাহলে সেগুলো সবই কি ছিল সাজানো? মনের কথা ছিলোনা সেসব? বাবা কি যেন বলেছিল? বড়ো হয়ে যাতে বাবার কোনো সম্পত্তি না দাবী করি – তাই আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখবে না। আমার মুখও দেখবে না কোনোদিন! স্ট্যাম্পপেপারে বাবা এসব কি করে লিখতে পেরেছিল গো? বাবার কাছে তার পৈতৃক সম্পত্তির দাম এতো বেশি? আশ্চর্য্য! মামমাম, আমি কিছুতেই ভেবে পাইনা – বাবা কি মানুষ? না কি অন্য কিছু – যার কাছে স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসা – এসব কিছুরই কোনো দাম নেই? আমি এটাও ভেবে পাইনা মামমাম যে এই লোকটাকে কি করে তুমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলে? একটুও কি তার ভেতরের আসল মানুষটাকে চিনতে পারোনি তখন? আমি কিন্তু আমার বাবাকে ভীষণ ঘেন্না করি মামমাম। বিশ্বাস করো, ভীষণ ঘেন্না করি!

আমি কিন্তু এটাও বুঝতে পারি যে তুমি কিন্তু বাবাকে এখনো ভীষণ ভালোবাসো। আর সেই জন্যই তার ইচ্ছেকে সম্মান জানিয়ে – আমায় ওই লোকটা ঠিক যেরকম চেয়েছিল – ঠিক সেরকম ভাবেই তার পছন্দের স্কুলে আমার পড়াশোনাটা এখনো চালিয়ে যাচ্ছো। এর জন্য তুমি একটু একটু করে রোজ নিজেকে শেষ করে চলেছে। তুমি মাসের মধ্যে কদিন রাতে ভালোভাবে ঘুমোতে সময় পাও বলতে পারো মামমাম? কদিন পেট ভরে তোমার পছন্দের খাবার খেতে পাও? এই সাত আট বছরে তোমার নিজের জন্য কটা পছন্দের শাড়ি কিনেছ? সবই তো আমার জন্য খরচ করে চলেছো! তোমার একটু একটু করে বুড়িয়ে যাওয়া আমার চোখে পড়ে। তোমার চোখের তলায় কালির ছোপ বেড়েই চলেছে। নিজের উপর উদাসীনতার ছাপ তোমার শরীরে আস্তে আস্তে প্রকট হয়ে উঠছে। আমি জানি আমি বললেও তুমি সেই একই রকমভাবে হেসে বলবে – "আমি তো ভালোই আছি। তুমি তাড়াতাড়ি ভালো করে পাস করে মানুষের মত মানুষ হয়ে দাঁড়াও, তখন আমার সব পরিশ্রম সার্থক হয়ে যাবে"। আমি জানি মামমাম – এটা তোমার একটা সাধনা। আমাকে ভালোভাবে মানুষ করে তোলার সাধনা! দুজনের সাধনা একজনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার সাধনা। চরম কৃচ্ছসাধন।

মামমাম, তুমি যেন এটা ভেবে নিও না যে তোমাদের ডিভোর্সের জন্য আমি তোমাকে দায়ী করি! একদমই করি না! তোমার এই সিদ্ধান্তটা একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। রোজ একটু একটু করে অসম্মানের চেয়ে, ভালোবাসাহীন দাম্পত্যের চেয়ে, রোজকার অশান্তির চেয়ে – তুমি বাবার থেকে মুক্তি চেয়েছিলে! এর আরো একটা কারণ ছিল। আমার সামনে রোজকার এই ঝগড়া অশান্তির থেকে আমাকে বাঁচিয়ে তুমি আমায় একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ দিতে চেয়েছিলে তুমি। একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে তুমি। আর তুমি সেরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে বলেই বোধ হয় সেটাতে বাবার পুরুষত্বে আঘাত লেগেছিল। আর তাই বাবাও হয়ত এমন অনেক অদ্ভুত শর্ত লাগিয়ে ছিল তোমাদের ডিভোর্সের পেপারে। বাবা বোধহয় দেখতে চেয়েছিল যে তার কোনোরকম কোনো সাহায্য ছাড়াই কিভাবে সব কিছু চালাতে পারো তুমি! আর তুমিও সেই চ্যালেঞ্জটা নিয়ে নিলে মামমাম বাবার কাছ থেকে। কোনরকম বিবাহ-বিচ্ছেদজনিত ক্ষতিপূরণ চাইলে না নিজের জন্যে, আমার জন্যেও না।

বাবা বলেছিল আমার সঙ্গে কোনদিন কোন যোগাযোগ রাখবে না। আমি যাতে ভবিষ্যতে বাবার কোনো সম্পত্তি না দাবি করতে পারি – সে জন্য প্রথম থেকেই একেবারে আমায় মুছে দিতে চাইলো। আর সেসব লিখিত আকারে তোমাদের ডিভোর্স পেপারে লিখেও দিল। আমি জানি তুমি সেসব দেখে ভীষণ আঘাত পেয়েছিলে, কিন্তু অসম্মানের সাথে তুমি কোনো আপস করতে চাওনি। তুমি সম্মানের সাথে কষ্টের পথ টাই বেছে নিয়েছিলে।

অথচ কি সামান্য ব্যাপারে অশান্তি হতো তোমাদের! মনে আছে, তুমি যখন মাসের শেষে তোমার হসপিটালের মাইনে নিয়ে বাড়ি ঢুকতে, তখনি বাবা তোমার থেকে কিছু দামি জিনিস কিনে দেওয়ার বায়না করতো। আর নয়তো তোমার হাত থেকে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে নিজেই সেসব কিনতে ছুটতো। বাবা দামি দামি কতগুলো ফোন কিনেছিল বলোতো? ঘড়ি? একটা মানুষের কি করে ইচ্ছে হতো - তার বৌয়ের সারা মাসের এতো কষ্টের টাকা থেকে প্রতিমাসেই এসব দামি দামি জিনিসপত্র কিনতে? তোমায় কোনোদিন কোন উপহার নিজের থেকে কিনে দিয়েছে কোনোদিন? কি যে বলছি, আমাকেই কোনোদিন কোনো কিছু কিনে দেয়নি! আমার জন্মদিনে বা পুজোতেও আমার জন্য একটা জামাও কিনে আনেনি কোনোদিন। যেটুকু আমি পেয়েছি – তা শুধু তোমার থেকেই পেয়েছি আমি। বাবার কি কোনো সেরকম রোজগার ছিলোনা মামমাম? বাবার যে কিসের একটা দোকান ছিল বলেছিলে? অবশ্য কখন যে সেই দোকানে যেত – কে জানে! সব সময়েই তো দেখতাম বন্ধুদের সাথে পাড়ার রকে বসে আড্ডা দিতো! কি দেখে তুমি বাবা কে বিয়ে করেছিলে মামমাম? আমার কাছে কিন্তু একটা নিকৃষ্ট জীব আমার এই জন্মদাতা পিতা। কারণ, নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য ছেড়ে সমস্ত বোঝা তোমার কাঁধে তুলে দিয়ে নিজে শুধু শুধু পালিয়ে গেল আমাদের ছেড়ে। আর তুমিও যেমন স্বেচ্ছায়

একদিন নিজের বাড়ি ছেড়ে, নিজের সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের কথা অগ্রাহ্য করে বিয়ে করেছিলে তাকে ভালোবেসে। আবার নিজে সম্মান নিয়ে চলার জন্যে, আমায় ভালোভাবে মানুষ করার জন্য সমস্ত দায় দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে তাকে চলে যেতেও দিলে – তোমাদের সেই যৌথ স্বপ্নের জায়গায় আমায় পৌঁছে দেবে বলে! আই লাভ ইউ মামমাম। আমি তোমায় খুব খুব খুব ভালোবাসি! আর তুমি ছাড়া আমারই বা আর কে আছে বলো তো? আমায় আর একটু সময় দাও মামমাম, আমি ঠিক তোমার এই কষ্টের মূল্য দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবো আর তারপর তোমার সব চাকরি ছাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে রেখে দেবো। তোমায় আর কোনো কষ্ট করতে দেবো না, তুমি দেখো! আমি ঠিক এটাই করব!

আমার সঙ্গে আমার ভাগ্যেরও কি পরিহাস দেখো, যে বাবাকে আমি সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি, সেই বাবার মতোই দেখতে হয়ে উঠছি আমি একটু একটু করে। ওরকমই লম্বা, শরীরের গঠন, এমনকি বাবার সঙ্গে আমার মুখেরও কি আশ্চর্য্যজনক মিল! খুব ভয় করে মামমাম, বাবার সঙ্গে শারীরিক মিলের সাথে – মনের মিল, চিন্তা ভাবনার মিলও যদি কোনোদিন হয়ে ওঠে আমার? এই একটা ব্যাপার খুব ভাবায় আমায়, জানো? খুব ভয়ও পাই আমি! অবশ্য আমি বিশ্বাস করি – এরকম অমানুষ আমি কোনোদিনও হবো না। আমি পুরো তোমার মতো হবো মামমাম, আমি শুধু তোমার মতোই হতে চাই!

মামমাম, মাঝে মাঝে ভাবি – যদি বাবা একদিন হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি কি করবো? আমি ভেবে উঠতে পারি না যে আমি তখন ঠিক কি করবো? মুখের ওপর দু-চার কথা শুনিয়ে দেব? চোখের সামনে থেকে চলে যেতে বলব? নাকি আমি নিজেই অন্যদিকে চলে যাব কোনো কথা না বাড়িয়ে? এরকম অনেক কিছুই আমি ভাবি মামমাম। কিন্তু আমি জানি সে আর হবার নয়। বাবা আর কোনোদিন ও ফিরে আসবেনা আমাদের কাছে। আমার বাবা আর যা হোক আমায় কোনদিনই ভালোবাসেনি আমায়, আমাদের। সবটাই ছিল তার অভিনয়। যদি বাবা আমায় একটুও ভালবাসতো কোনদিন, তাহলে তার আদরের মামবুড়িকে ওই অতো ছোট বয়সে ওইভাবে ফেলে চলে যেতে পারতো? তুমিই বলো? তাই বাবাকে আমি ভীষণ, ভীষণ ঘেন্না করি।

তবে একটা কথা কি জানো, মামমাম সত্যি বলছি, এই ছুটি পড়ার সময় যেমন তুমি আমায় নিতে আসো, তেমনি আমার অনেক বন্ধুদেরও তাদের বাবারা নিতে আসে। এমনকি অনেকের মা বাবা একসাথে এসেও তাদের নিয়ে যায়। তখন কিন্তু আমার সত্যিই চোখে জল এসে যায় মামমাম আমার বাবা থেকেও নেই বলে। আমার বন্ধুরা তাদের বাবাদের কাছে কত কি আবদার করে, কাছে টানে। আমার্ সেরকম কেউ নেই বলে তখন আমার খুব দুঃখ হয়। আমার চোখে জল এসে যায়। একবার জানো আমার বন্ধু ইরা বলেছিল, তোর বাবা কেন কোনোদিনও তোকে নিতে আসে না রে? বাবার একবারও সময় হয়না আসার? জানো মামমাম, আমি একটুও সময় না নিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে সেদিন ওকে বলেছিলাম – আমার বাবা নেই। বাবা মারা গেছে। তাই মা-ই হচ্ছে আমার সব কিছু। মা একাধারে আমার বাবা এবং মা।

ভালো থেকো মামমাম, অনেক ভালো থেকো। অন্ততঃ আমার জন্যেও অনেক ভালো থাকতে হবে তোমায়।

ইতি –
তোমার মামমাম

প্রতীক্ষা

চৈতালি দত্ত

জয়াবতী বসে আছেন। জুহু বীচের হুহু বাতাসে টাইট করে এঁটে বাধা পনিটেল এর বাঁধন অগ্রাহ্য করেই কানের পাশের কেশগুচ্ছ দুর্বার হয়ে সমানে উড়ছে। ভাবছেন তো বিশাল বিত্তবান কোন এন আর আই এর গল্প ফেঁদে বসেছি। একদমই তা নয়। জয়াবতী কলকাতার এক মাঝারি মাপ ও খ্যাতির কলেজে শিক্ষকতা করেছেন সারা জীবন। বিত্ত বা ঝলমলে জীবনের প্রতি কোন আকর্ষণই ছিল না তার । এই ভাবেই তো যমজ দুই পুত্র শিমুল ও পলাশকে বড় করা, লেখাপড়া শেখানো - সবই করেছেন। কোন ভয় বা লোভ তাকে বিচলিত করেনি। প্যাটেল দম্পতির সঙ্গে পরিচয় তো সম্প্রতি। এবং সে পরিচয় ও আকস্মিক ও অকল্পনীয়। জয়াবতীকে ওরা নিজেদের কন্যাসম দেখেন। একমাত্র পুত্র তাদের মার্কিন মুলকে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক। তাই হয়তো ওদের সব স্নেহ ভালোবাসা, জয়াবতীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে ওরা দুজনেই ছেলের কাছে গেছেন; সুতরাং জয়াবতী ছাড়া আর কে এই বিশাল ফাঁকা ফ্ল্যাটে এসে থাকবেন? কাজের লোকজনদের সঠিকভাবে পরিচালনা করবেন? কিংবা প্রতিষ্ঠিত গোপালের নিত্য সেবার ব্যবস্থা করবেন? জয়াবতীও এসব কর্তব্য স্বাভাবিকভাবেই তার করণীয় অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন। এসব কিছু সামলেও তার হাতে অনেকটা সময় থেকে যায়।, যখন মনের আকাশে স্মৃতির মেঘ এসে ভিড় করে।

কি সেই স্মৃতি? জয়াবতী যাকে কোনভাবেই সরিয়ে রাখতে পারছেন না। আজ এই বয়সে এসে সেই স্মৃতির মায়াজালে ধরাই বা পড়ছেন কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর জয়াবতীর জানা নেই। আছে শুধু এক অদ্‌ভুত আকুতি। এক আশ্চর্য দায়বদ্ধতা।

জয়াবতী তখন মাত্র ১৩ বছরের বালিকা। উত্তর কলকাতার একটি সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। উত্তর কলকাতার ভাড়া বাড়িতে শৈশব ও কৈশোর কেটেছে তার। তখনই তার দেখা হয়েছিল প্রায় সমবয়সী একটি সাধারণ ছেলের সঙ্গে। দেখা মাত্র কোন্ অজানা কুহকে পরস্পরের চোখ আটকে গিয়েছিল, পলক পড়েনি। দুজনেই স্থির দৃষ্টিতে একে অপরের চোখে চেয়েছিলেন—-কতক্ষণ তা কেউ জানে না। সেই প্রথমবার।

এরপর থেকে, যখনই যতবার জয়াবতীর মন আকুল হয়েছে, তখনই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু লজ্জায় জয়াবতীর কন্ঠ চুপ থেকেছে। কোন কথা বলা হয়নি। রক্ষণশীল বাড়ির ভয়ও কম ছিল না। একবার দুজনেই যখন বড় হয়েছেন, কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সে তখন অনেক করে ছোটবেলার ব্যাপার ভুলে যেতে বলেছিল, জয়াবতী নিশ্চুপ থেকেছেন।তারপরে অনেক কটা বছর জয়াবতীর জীবনে অনেক তোলপাড় হয়েছে; জয়াবতীর জীবনে আদিত্য এসেছেন। বাড়ির চাপ ও আদিত্যের ব্যস্ততায় সেই ঘটনা পরিণতির দিকে এগিয়েছে- তারপরের অন্ধকার দিনগুলির কথা আর জয়াবতী মনে করতে চান না। অনেক দুঃখময় দিনের পরে প্রথম সূর্যের আলোর মতো জয়াবতীর কোলে এলো শিমুল, পলাশ।

তখন তো জয়াবতীর জীবনে প্রায় নিঃশ্বাস ফেলারও অবকাশ ছিল না। আদিত্য কোন দায়িত্ব নিতেন না, শ্বশুর- শাশুড়ি তখন জীবিত থাকলেও তারাও মুখে আদর জানানো ছাড়া আর কিছু করেন নি। তাই জয়াবতী বাধ্য হলেন উত্তর কলকাতায় মায়ের বাড়িতে ফিরে আসতে।

আবার চলল নিরন্তর সংগ্রাম। অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যুদ্ধটাই বড় হয়ে দাঁড়ালো। দুই পুত্রকে মনের মত করে মানুষ করার জন্য জয়াবতীকে চাকরির পাশাপাশি টিউশনিও করতে হয়েছে।

যমজ হলেও দুজনে মনের দিক থেকে দু'রকম। পলাশ হসী স্পষ্ট বক্তা, নিজের চাহিদা দাবিতে পরিণত করতে তার কোন সংকোচ নেই। অন্যদিকে শিমুল নরম স্বভাবের ছেলে। সে কিছুই চায় না বলে তার জন্য জয়াবতী সদাই উৎকণ্ঠিত থাকতেন। গভীর সংবেদনশীল মানসিকতা শিমুলের- কিন্তু সেটিকে কেউ যেন ওর দুর্বলতা বলে মনে না করে, এই চিন্তা জয়াবতীকে ভাবিয়ে তোলে এখনো। আদিত্যের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ যখন হয়, শিমুল, পলাশ তখনও কৈশোরের সীমা ছাড়ায়নি। অনেক আগে থেকেই অবশ্য আদিত্য ও জয়াবতী, ছেলেদের নিয়ে আলাদা থেকেছেন।

তখন কোন স্মৃতির হাতছানিতে সাড়া দেবার মত মানসিকতাই ছিল না তার। দীর্ঘদিন কেটে গেছে তারপর। জয়াবতী এখন অধিকাংশ সময়ে শিমুলের কাছেই থাকেন। অবিবাহিত শিমুলের দিকে খেয়াল রাখেন আর ভাবেন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে আর একবার কি দেখা হবে না? আশা ছাড়তে পারেন না জয়াবতী। নিশ্চয়ই হবে। প্রতীক্ষা করেন।

প্রবন্ধ

চৈতন্য কথা

উৎপলা পার্থসারথি

ঐ যে দেখা যায় কত মানুষ নগর সংকীর্তনে বেরিয়েছে; আর তাদের সবার সামনে এগিয়ে আসছেন এক দীর্ঘদেহী গৌরবর্ণ পুরুষ। তাঁর পিছন পিছন দুহাত তুলে ভাবের ঘোরে কৃষ্ণ নাম নিতে নিতে এগিয়ে আসছে শত সহস্র মানুষ। সমাজের চোখে তাদের কেউ চণ্ডাল, কেউ মুচি আবার কেউ অচ্ছ্যুৎ বা অস্পৃশ্য! সঙ্গীত এর মত এত শক্তিশালী জনসংযোগ মাধ্যম খুব কমই আছে। আজ থেকে কয়েক শতাব্দী আগে চৈতন্যদেব খুব বুদ্ধি করেই কীর্তনকে ব্যবহার করেছিলেন জাতিভেদের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের মানুষকে একত্রিত করতে। শত শত মানুষ ভাবের ঘোরে কৃষ্ণ নামে পাগল হয়ে উঠেছিলেন। সঙ্গীত অবশ্য আজও আমাদের পাগল করে, জোটবদ্ধ করে– শুধু সময়ের সাথে সাথে পটভূমিটা বদলে যায়।

চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন একজন বাঙালি আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং সমাজ সংস্কারক যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (১৪৮৬ খ্রিঃ – ১৫৩৪ খ্রিঃ) গৌড়বঙ্গের নদিয়া অন্তর্গত নবদ্বীপে (অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলা) পিতা হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রী জগন্নাথ মিশ্র ও মাতা শ্রীমতী শচীদেবীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বাশ্রমের নাম শ্রী বিশ্বম্ভর মিশ্র' , কিন্তু তাহার গাত্রবর্ণ গৌর ও স্বর্ণালি আভাযুক্ত ছিল বলিয়া তাঁহাকে 'গৌরাঙ্গ' বা 'গৌরচন্দ্র' নামে অভিহিত করা হইত; অন্যদিকে, নিম্ব বৃক্ষের নীচে জন্ম বলিয়া তাহার মাতা তাঁহাকে 'নিমাই' বলিয়া ডাকিতেন। আসলে শচীদেবীর প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ খুব অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন এবং তারপর তাঁর আরো কয়েকটি সন্তানের অকালমৃত্যু হয়। তাই তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান এর নাম নিমাই রাখেন যে কিনা নিমের মত তিক্ত হবে এবং যম তাকে নিতে পারবে না এমনই প্রথা ছিল, এবং তার থেকেই তিনি পরবর্তী কালে নিমাই পন্ডিত বলে খ্যাত হন। ১৪ বছর বয়েসে তাঁর প্রথম বিবাহ হয় নবদ্বীপের এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত, কিন্তু সর্পদংশনে তাঁহার মৃত্যু হয়, তাই তিনি আবার বিবাহ করেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে। তবে ২৪ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন।

সেন রাজবংশের সময় নবদ্বীপ ছিল বঙ্গের অন্যতম রাজধানী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে বক্তিয়ার খিলজি এই নবদ্বীপ জয় করেই বাংলা জয়ের সূচনা করেন। নবদ্বীপের সমৃদ্ধি বহুকালের, গঙ্গাতীরে নবদ্বীপ তখন বাংলাদেশের অন্যতম বানিজ্য ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত ছিল। বাংলাদেশের নানা অঞ্চল থেকে গুণীজ্ঞানী ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও জীবিকাপ্রার্থীদের আগমনে নবদ্বীপ খুবই বড় আকার ধারন করিতে থাক। তবে কিছুদিনের মধ্যে হঠাৎই নানা রাজনৈতিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে , বাংলার মসনদে একজন রাজা বসলে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁকে হত্যা করে অপর একজন রাজা হয়ে বসত আর এরা সবাই মোটামুটি মুসলমান রাজা ছিলেন। কিছুদিন পর গনেশ নামে এক হিন্দু রাজা নবদ্বীপে রাজত্ব করতে থাকেন তবে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পুত্র ধ্রব মুসলিম ধর্ম গ্রহন করে জালাউদ্দিন নাম গ্রহণ করেন এবং পিতার সিংহাসন অধিকার করেন।এরকম ভাবে শাসক শ্রেণীর ক্রমাগত পরিবর্তন হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের উপর এর খুবই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নমানের ও নিম্নবিত্তের মানুষের উপর অত্যাচার করতে শুরু করে, এবং সাধারণ মানুষের জীবনে খুব কষ্ট ও অশান্তি নেমে আসে।

তবে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের কিছুকাল পরে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক অশান্তি কমতে শুরু করে। ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন অধিকার করেন আলাউদ্দিন হোসেন শাহ, এবং উনি দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।

হিন্দুদিগের মধ্যে উচ্চবর্ণের শিক্ষিতরা সরকারি চাকুরি ইত্যাদি করিয়া অভিজাত শ্রেণিতে উন্নীত হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু অন্য-দিকে পুনরায় দেখা যায় অনুন্নত সমাজের মনুষ্যগণ অবহেলিত হইতেছিল। ঐশ্বর্য্যের সহিত দারিদ্র সহাবস্থান করিতেছিল। উচ্চশ্রেণির জীবনযাপনে "ম্লেচ্ছাচার" প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, তখন মানুষ অত্যন্ত ধর্মবিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল। ধর্মকর্মের মধ্যে ছিল সারারাত্রি জাগিয়া "মঙ্গলচণ্ডীর গীত" শোনা, মদমাংস দিয়া "যক্ষপূজা", ও ধূমধাম করিয়া বিষহরির পূজা করা আর পুত্রকন্যার বিবাহে অর্থের অপচয় করা। এইবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে সে সময়ে সমাজের মধ্যে মূঢ়তা ও উদ্দেশ্যহীনতার মানসিকতা সৃষ্টি হইয়াছিল, যা একদল চিন্তাশীল ও ভাবুককে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। রামানন্দ বসু, রূপ-সনাতনের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত, ধনী ও অভিজাত উচ্চ বংশের শিক্ষিত হিন্দুগণ উদ্দেশ্যহীন ঐশ্বর্য প্রতিষ্ঠার অসারতা অনুভব করিতেছিলেন।এ হেন সময়ে আবির্ভাব হয় নিমাই এর। বাল্যকালে তাঁকে তাঁর ভক্তরা স্বয়ং কৃষ্ণ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেন এবং ভাবেন যে, এই জগতের মানুষকে ভক্তির প্রক্রিয়া এবং জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জনের পদ্ধতি শেখানোর জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজে ধরাধামে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী র চৈতন্যেচরিতামৃত গ্রন্থ এই ঘটনার সাক্ষ্য দেয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চিন্তাধারা ছিল মূলত ভক্তি ও প্রেম-ভিত্তিক। তিনি কৃষ্ণভক্তির প্রচারক ছিলেন এবং "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র জপ করার মাধ্যমে ইশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদন করার শিক্ষা দেন। তিনি জাতিভেদ প্রথা এবং আনুষ্ঠানিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সকলের জন্য শ্রী ভগবানের প্রেম উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্য কীর্তন (ধর্মীয় গান) এর মাধ্যমে ইশ্বরের নাম জপ করার ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে, কীর্তনের মাধ্যমে প্রেম ও ভক্তির উন্মেষ ঘটে।

শ্রীচৈতন্যের ধর্ম ছিল প্রেমের ধর্ম। তিনি বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁর পথ ছিল সহজ ও সাধারণ মানুষের বোধগম্য। "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে যে কেউ ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে বলে তিনি মনে করতেন। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর জোর দেয়। তিনি সকল মানুষকে ভালোবাসতে এবং সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে উৎসাহিত করতেন ।

শ্রীচৈতন্যের এই চিন্তাধারা গৌড়িয় বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করে এবং আজও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এর গভীর প্রভাব দেখা যায়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস জীবন ছিল তাঁর জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। চব্বিশ বছর বয়সে তিনি কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি জন্মভূমি নদিয়া ত্যাগ করে বিভিন্ন তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করেন, যার মধ্যে নীলাচল, দাক্ষিণাত্য, ও বৃন্দাবন উল্লেখযোগ্য। নিমাই পণ্ডিত থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সন্ন্যাস জীবন ছিল এক নতুন যাত্রা, যেখানে তিনি ঈশ্বর প্রেমে নিজেকে উৎসর্গ করেন। এই সময় তিনি কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার করেন এবং তাঁর শিক্ষা ও কীর্তনের মাধ্যমে ভক্তি আন্দোলনের প্রসার ঘটান।

ষোড়শ শতাব্দীতে নদিয়ার নিমাই ভক্তিরসের জোয়ারে নিস্তরঙ্গ বঙ্গসমাজে যে বিপ্লব ও নবজাগরণ নিয়ে এসেছিলেন, তার প্রভাব ছিল সুদুর প্রসারী। সপ্তাদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বাংলার গ্রামে গ্রামে মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতিতেই বাংলায় তৈরি হল 'চালা মন্দির', যা একান্তই বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য। শুধু চালা বা রত্ন মন্দিরই নয়, বরং বাংলার দোলমঞ্চ ও রাস মঞ্চ নির্মাণের সাথেও চৈতন্য আন্দোলনের গভীর যোগসূত্র আছে। শুধু বাংলা মন্দিরের আকৃতিই নয়, বাংলার মন্দির ভাস্কর্যের গায়ে যে অনন্যসাধারন টেরাকোটার কাজ দেখা যায়, বিভিন্ন আঙ্গিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তা শুধু ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীতে ও বিরল।

একথা সত্যি যে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের ছাপ স্থাপত্যে ফুটে উঠতে বেশ খানিকটা সময় নেয়; বরং তা অনেক দ্রুত ফুটে ওঠে সঙ্গীত ও সাহিত্যে। কিন্ত চৈতন্য আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

চৈতন্য আন্দোলনের পর থেকে প্রায় দীর্ঘ পাঁচশো বছর কেটে গেলেও বাংলার বুকে এমন বড় মাপের সামাজিক আন্দোলন হয়নি যার প্রভাব এসে পড়েছে স্থাপত্যে। রাজনীতিক ও সামাজিক পালাবদল এবং যুগের অগ্রগতির সাথে সাথে বাংলার স্থাপত্যও বদলেছে ঠিকই কিন্ত চৈতন্য আন্দোলনের তীব্রতায় মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে যেভাবে বাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য রীতিতে নিজস্ব সত্তার জন্ম হয়েছিল তা সত্যিই বিরল!

এতগুলো কথা লিখলাম শুধু একটা কারণেই। বাংলার বুকে চৈতন্য আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী প্রভাবটা বোঝাতে। অথচ কি আশ্চর্য বলুন, এরকম ক্ষণজন্মা এক প্রতিভার মৃত্যুটাই রহস্যাবৃত; সম্ভবত তাকে খুন করা হয়েছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে। আমরা অধিকাংশ বাঙালি হয়ত তার খোঁজ ও রাখি না! আমরা কত জন জানি যে এই চৈতন্য হত্যার কিনারা করতে গিয়েই ১৯৯৫ সালে জ্বলজ্যান্ত এক বাঙালি (জয়দেব মুখোপাধ্যায়) খুন হয়ে গেলেন পুরীতে। শ্রীচৈতন্যের মত একজন মানুষ কে যদি খুন হতে হয় তো তার পেছনে একটা “কেন” তো থাকবেই।

কেন করেছিল এবং কারা করেছিল? এর একটা উত্তর বলে, চৈতন্য নাকি বাংলার মুসলমান শাসকের চর ছিলেন! আর তাই চৈতন্যর উড়িষ্যায় আগমনের পরেই প্রথমবারের জন্য গৌড়ের মুসলমান শাসক উড়িষ্যায় সফলভাবে হামলা করতে পেরেছিল। যদিও শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু রহস্য এখনও অমীমাংসিত, তবে এর তিনটি অনুমান আছে যেমন

- সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাওয়া:কিছু মানুষের বিশ্বাস, তিনি পুরীর সমুদ্র "স্বর্গদ্বারে" হেঁটে গিয়ে সমুদ্রে মিশে গিয়েছিলেন।
- জগন্নাথ মূর্তিতে লীন:কারো কারো মতে, তিনি জগন্নাথ দেবের মূর্তির সাথে মিশে গিয়েছিলেন।
- হত্যা:কিছু মানুষের ধারণা, তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আবার অনেকে বলেন
- আত্মহত্যা বা স্বাভাবিক মৃত্যু:কিছু মানুষের বিশ্বাস, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন বা স্বাভাবিকভাবে মারা গিয়েছিলেন।

এইসব মতামতের সমর্থনে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

অনুভূতির রঙে রাঙা নৈকট্য ও বিরহ তথা বাংলা সাহিত্য

কৃষ্ণা পাল

বৈচিত্র্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা মানব জাতিকে যেভাবে দেখছি, "তা" হাজার হাজার বছরের জটিল জৈব বিবর্তন এবং পারিপার্শ্বিক ঘাত- প্রতিঘাতের মাধ্যমে উদ্‌ভূত পরিস্থিতির অনিবার্য ফল। এই বিবর্তনের মূলে রয়েছে এক "মন্ত্র" যাকে আমরা বলি survival of the fittest। জগত সৃষ্টি ও জৈব বিবর্তনের ধারায় সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হতে হতে কত না প্রাণী এই সংসার থেকে বিলুপ্ত হয়েছে তার সঠিক বিবরণ আমাদের অজানা। তথাপি এই বিবর্তনের মাঝে মানবজাতি স্বমহিমায় আজও বিদ্যমান এবং বৈজ্ঞানিকরা আশা করছেন ভবিষ্যতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে উন্নততর মানবজাতির বিকশিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

মনুষ্য বা মানবজাতি শুধুমাত্র একটি জৈবিক সত্তা নয় - অন্য প্রাণী জগত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শরীর বা দেহ, মন, আত্মা এবং সর্বোপরি এক জটিল ও অতি সংবেদনশীল অঙ্গ, যাকে আমরা মস্তিষ্ক বলি - এই নিয়ে পরিপূর্ণ মানব শরীর।

আহার-বিহার আর বংশবিস্তারের জন্য প্রজনন করার প্রেরণা ব্যতীত মানব ই একমাত্র জীব যার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক) এবং ষড় ঋপুর অভূতপূর্ব সমাহারে মানুষের মাঝে আপনা আপনি সৃষ্টি হয় সূক্ষ্ম -সূক্ষ্ম মানবিক বা অতিমানবিক বা ঈশ্বরিক গুণাবলী। আর এর ফলে মানুষের মাঝে সুর এবং অসুর এবং স্বর্গ ও নরক- দুই বিপরীত ধর্মী গুণের সমাহারে সৃষ্ট এক আশ্চর্য জীব মানব।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু ঘটনা ঘটে তার মূলে রয়েছে শক্তির রূপান্তর। বিজ্ঞানের ভাষায় এই শক্তি নিহিত অণু ও পরমাণুর মধ্যে। আর অনু ও পরমাণুর সমন্বয়ে তৈরি হয় জীব কোষ এবং পরিশেষে পূর্ণাঙ্গ জৈবিক অবয়ব আর এটা মনুষ্য, অন্য প্রাণী ও জীবজগতের জন্য অকাট্য সত্য। মানুষের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণাবলী থাকে যা বংশগত, অন্য গুনগুলি ঈশ্বর প্রদত্ত। যেমন মানুষ ভালো মন্দ বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মানুষের মধ্যে আছে স্বকীয় সৃজনশীলতা।, যুক্তিবাদী চিন্তন ক্ষমতা, আত্ম সচেতনতা, কর্মফল সম্বন্ধে ধারণা, যা তাদের নৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে ও নিজেদের কার্যের জন্য উত্তর দায়ী করতে সাহায্য করে। সৃজনশীলতা একটি গুণ, যা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ধারক ও বাহক। মানুষই বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে নিজেদের মধ্যে সামাজিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপন করে উন্নততর জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সক্ষম। এইসব কারণে মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে গণ্য করা হয়। আর ঈশ্বরবাদীরা মনে করেন মানুষ ঈশ্বরের প্রতিভু এবং ঈশ্বর নির্দেশিত কার্য সম্পাদন করার জন্য ঈশ্বর কতৃক পৃথিবীতে প্রেরিত । অবশ্য এগুলি মনুষ্যজাতির স্বঘোষিত অভিব্যক্তি এবং তর্ক সাপেক্ষ ।

বর্তমান আলেখে আমি মানব জীবনের দুইটি পরস্পর বিরোধী অনুভূতি – 'নৈকট্য' ও 'বিরহে'র সম্বন্ধে কিছু তথ্য এবং এই দুই অনুভূতির রঙে রঞ্জিত হয়ে বাংলা ভাষাকে কিভাবে সমৃদ্ধ করেছে এবং মানব জীবনে এদের কি প্রভাব সে ব্যাপারে কিছু কথা পাঠক মন্ডলীর সম্মুখে উপস্থাপিত করার প্রয়াস করছি ।

নৈকট্য: প্রথমে আসা যাক নৈকট্য সম্বন্ধে কিছু ব্যক্ত করার। বাংলা অভিধানের আক্ষরিক অর্থে 'নৈকট্য' বলতে বোঝায় কাছে থাকা বা পাওয়া, অন্তরঙ্গতা(closeness) , সৌহার্দ্য বা বন্ধুত্ব । দৈনন্দিন জীবনে 'নৈকট্য' শব্দটি বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হতে পারে। এটি শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক বা যেকোনো ধরনের সম্পর্ক বা অবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সৃষ্টির আদিতে রয়েছে নৈকট্য, নর-নারীর মধ্যে যে প্রেমের সঞ্চার হয় তার প্রাথমিক ধাপ নৈকট্য আর পরবর্তী পর্যায়ে প্রেমের পরিণতি। উভয়ের মধ্যে নিবিড় শারীরিক ও মানসিকভাবে একে অপরের বন্ধুত্ব বা অন্তরঙ্গতা আর পরিশেষে আরো একাত্ম হয়ে পাবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা । নর-নারীর যৌন মিলন নিছক শারীরিক অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে দৈহিক সুখ লাভ নয়। এর উপরে আরো অনেক কিছু থাকে যা আমাদের মানসিক প্রশান্তির বা স্বর্গীয় আনন্দ লাভের উপায় হিসেবে গণ্য করতে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। দৈহিক মিলনের

পরবর্তী সময়ে গর্ভসঞ্চার এবং মাতৃগর্ভে, ভ্রুনের সঞ্চার। মাতৃগর্ভে প্রাণের সঞ্চারের সাথে কিছু কাল পরে গর্ভবতী মাতা যখন নিজ গর্ভে শিশুর নড়াচড়া শুরু হয় তখনই গর্ভস্থ শিশুর নৈকট্য অনুভব করে। এই নৈকট্যর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া কতটা সুখদায়ী তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না । সৃষ্টির আনন্দে মাতোয়ারা নারী এখন "মাতা" হতে চলেছেন । গর্ভস্থ শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে কত চিন্তা, কল্পনার জাল বোনা আর অন্তরে জন্ম নেয় অপত্য স্নেহ আর মাতৃস্নেহের ফল্গুধারা, শিশুর ভূমিষ্ঠ হবার পর সঙ্গে পায় মায়ের নৈকট্য, যা অমৃতরূপী স্তনধারা হয়ে ঝরে পড়ে শিশুর মুখে। নবজাতকের প্রতি অপত্য স্নেহ কেবলমাত্র মানব জাতির মধ্যে দেখা যায় তা নয়। বন্যপ্রাণী ও পশুপক্ষীর মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই নৈকট্য, এই ভালোবাসা, এই স্নেহ বন্ধন কেবলমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে নবজাতককে রক্ষা করা ও ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার দায়িত্বের অতিরিক্ত আরো অনেক মহত্বপূর্ণ ।

নৈকট্যের প্রকারভেদ :

i) *শারীরিক নৈকট্য* : এটাকে আমরা কাছে পাওয়ার আকুতি বলে থাকি । এটা প্রেমাস্পদের মধ্যে পিতা-মাতা ও সন্তান, গুরু- শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব বা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে চাক্ষুষ উপস্থিতিকে বোঝায় । কাছে আসার আকুতি, হৃদয়ের স্পন্দন, বৃষ্টির ফোঁটার মতো তোমায় আলিঙ্গন, দূরে থেকে তুমি আছো কাছে - এই অনুভবই তো ভালোবাসার ভাষা।

ii) *মানসিক নৈকট্য:* মনের গভীরে লুকানো অব্যক্ত কিছু কথা, তোমার সাথে ভাগ করে নিতে চাই, জীবনের কিছু পাতা, শব্দহীন ভাষা, চোখের ইশারা, এটাই তো সম্পর্কের গভীরতা।

iii) *আধ্যাত্মিক নৈকট্য* : ভৌতিক জগতের বাহিরে মানুষের আর একটা জগৎ আছে বা থাকা উচিত একে আমরা বলি ঐশ্বরিক জগৎ । মানুষের চরম লক্ষ্য সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মিলিত হবার, ঈশ্বরের সান্নিধ্য, আত্মার শান্তি, ধ্যানের গভীরে খুঁজে যাওয়া যায় জীবনের সারমর্ম, তোমার উপস্থিতি, এক অনন্ত আশীর্বাদ ।

iv) প্রকৃতির নৈকট্য : প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নৈকট্য বা সান্নিধ্য জন্ম লগ্নের সময় থেকে যতক্ষণ না শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত । মাতৃগর্ভের গহন অন্ধকার থেকে শিশু যখন ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হয় তখনই প্রকৃতির সান্নিধ্য অনুভব করে আর এই অনুভবের আলোয় তার চোখ খুলে যায়, আর মিষ্টি মিষ্টি চোখে দেখতে চায়, অনুভব করতে চায়। তার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু মাতৃক্রোড়ে সুরক্ষিত আশ্রয় স্থলের অতিরিক্ত প্রকৃতি মাতার সঙ্গে একান্ত হবার হাতছানি অনুভব করে । সামনে প্রশস্ত অঙ্গন, উপরে খোলা আকাশ, চারপাশে গাছ-গাছালি, প্রজাপতি, পাখিদের আনাগোনা ও তাদের কুজন - সবেতে শিশুর কৌতূহল! আর আশ্চর্য হবার বিষয়, এই সমস্ত বস্তু বা প্রাণীদের সঙ্গে একাত্ম হবার আকাঙ্ক্ষা থেকে শুরু হয় দুই সত্তার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন । প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক একে অপরের পরিপূরক, যেখানে প্রকৃতি মানুষকে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা আর মানুষ ও দায়বদ্ধ থাকে প্রকৃতিকে লালন-পালন ও রক্ষা করার ।

বাংলা সাহিত্যে নৈকট্যে : নৈকট্যের মাধ্যমে মানবহৃদয়ের সঞ্চারিত হয় প্রেমের ফল্গুধারা। এক স্বর্গীয় সুক্ষ অনুভূতি বা তারও উর্ধ্বে অনেক কিছু ।কবি, লেখক, সুরকার, গীতিকারের ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রতিভা ও আবেগের রঙে রঞ্জিত হয়ে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে। এর বিস্তারিত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যে নৈকট্য বিষয়ক রচনাবলীর প্রতিফলন লোকগীতি, কাব্য ও কবিতার কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না।

সংগীতের মাধ্যমে গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী নরনারীর মধ্যে সঞ্চারিত আবেগের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ঘনিষ্ঠতাকে সুরে সুরে ফুটিয়ে তুলেছেন। সুহৃদয় পাঠকমন্ডলীর সম্মুখে কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি– গীতা দত্তের সুরলিত কন্ঠে গাওয়া *"এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যা….."* এই গানে হৃদয়স্পর্শী সুরমূর্ছনার মাধ্যমে প্রেম ও একাত্মতার অনুভূতিকে অপূর্ব ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

"এই মেঘলা দিনে একলা" -- হেমন্ত মুখার্জির গাওয়া গানের মাধ্যমে বন্ধুত্বের বন্ধন ও তার আবেগের রাঙা মুহূর্তগুলি মনের মধ্যে এক হিল্লোলের সঞ্চার করে।

"সখি, তোরা প্রেম করিও না" -- একটা লোকসংগীত। এর মাধ্যমে প্রেমকে এক জৈবিক ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ হতে ও মিলন মধুর সম্পর্কের গভীরতাকে সম্যকভাবে প্রকাশ করার অনবদ্য প্রচেষ্টা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। আবার সুফীসন্ত ও কবি লালন ফকিরের লোকগীতি গুলিতে প্রেম ভালোবাসা এবং ঈশ্বরের প্রতি আত্মিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আকুলতার অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে অজস্র শ্যামা সঙ্গীত এর মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি অগাধ প্রেম ও দৈবিক একাত্মতা ও আবেগের দিক গুলি সুন্দরভাবে প্রকট হয়েছে।

নৈকট্য বা একাত্মতা বৈষ্ণব পদাবলীতে পঞ্চ রসের মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এই রস গুলি বিভিন্ন স্তরে ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয় এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তরা বিভিন্ন রূপে অনুভব করেন।

- *শান্ত রস* - এই রসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর বা সর্বোচ্চ সত্তা হিসেবে দেখা হয় এবং ভক্তরা শান্তভাবে তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। শ্রীকৃষ্ণের দাস বা সেবক হিসেবে উপলব্ধি করেন এবং আনন্দের সঙ্গে তার সেবা করতে প্রস্তুত থাকে।
- *সখ্যরস* - এই রসে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বন্ধুর মতো সম্পর্ক স্থাপন করে তারা একে অপরের সাথে খেলাধুলা ও প্রমোদের মেতে ওঠে।
- *বাৎসল্য রস* - এই রসে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে সন্তানের মতো ভালোবাসে, স্নেহের সাথে তার দেখাশোনা করে ও মঙ্গল কামনা করে।
- *মধু রস* - এটির বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ রস যেখানে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমিক বা প্রেমিকা রূপে অনুভব করে, এটি সবচেয়ে গভীর ও তীব্র রসের অনুভূতি।

যুগ যুগ ধরে কবি মনে প্রেমাস্পদের, প্রিয়জন, প্রকৃতি বা ঈশ্বরের প্রতি নৈকট্য, একাগ্রতা, সখ্য বা সমর্পণের অনুভূতি বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বলাকা" থেকে উদ্‌ধৃত কয়েকটা লাইন –

"তুমি কি কেবলই ছবি?
শুধু পটে লিখা
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়
ও যে যারা দিবারাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে, আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মত সত্য নও?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি
চির চঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও
পথিকের সঙ্গ লও,
ওগো পথহীন কেন রাত্রি দিন
সকলের মাঝে থেকে, সবা হতে আছো এত দূরে
স্থিরতায় চির অন্তঃপুরে।"

এইভাবে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন স্মৃতিপটে বাঁচিয়ে রাখা মুহূর্ত গুলিকে--

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই— আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল
আমার নিখিল তোমাকে পেয়েছে তার অন্তরের মিল"।

রবীন্দ্র নাথের প্রেম পর্যায়ের গানের মাধ্যমে নর-নারী বা প্রকৃতির সঙ্গে নৈকট্য বা একাত্মতার বিভিন্ন আঙ্গিক দিকগুলি প্রকাশ পেয়েছে । . এই গান গুলি প্রেমের সাধারণ প্রকাশ নয়, বরং মানবজীবনের গভীরতম আবেগ, আকাঙ্ক্ষা এবং উপলব্ধির এক সাহিত্যিক ও শৈল্পিক প্রকাশ, যা পাঠক ও শ্রোতাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে. অনেক গানে কল্পনার উচ্চতর মার্গ ও বাস্তব জীবনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে এক টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায় , যা প্রেম কে আরও সংবেদনশীল ও গভীর করে তোলে. নিম্নে রবীন্দ্রনাথ এর বিখ্যাত কয়েকটি প্রেম পর্যায়ের গানের উদাহরণ দেওয়া হলো।

"তুমি রবে হৃদয়ে মম, নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম, মম জীবন যৌবন, মম অখিল ভূবণ, তুমি ভরিবে গৌরবে নিশীথিনী সম ...."

"আমার সকল রসের ধারা তোমাতে, হোক না হারা , জীবন জুড়ে লাগুক পরশ , ভুবন বেপে লাগুক হরষ ,তোমার রুপে মরুক ডুবে ,আমার দুটি আঁখিতারা ...."

"আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে , যাবো না যে , রইনু পড়ে,ঘরের মাঝে, এই নিরালায় রব আপন কোনে , যাবো না এই মাতাল সমীরণে ...."

"আমি তোমার প্রেমে হবো সবার কলঙ্কভাগী , তোমার পথের কাঁটা করবো চয়ন ,যেথা তোমার ধূলায় শয়ন ...."

* আমার ব্যাথা যখন আনে তোমার দ্বারে, তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও ডাক তারে, বাহুপাশের কাঙ্গাল সে যে চলছে তাই সকল ত্যজ্য ...."

কাজী নজরুল ইসলাম এর গান গুলি মানবিক প্রেম কে মহা জাগতিক প্রেমে উত্তরণের মাধ্যমে এক আধুনিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে, যা চিরায়ত রোমান্টিকতাকে ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর গানে প্রেম শুধু আবেগ নয়, কর্মের প্রেরণা ও শোকের সান্ত্বনা যা মানব জীবনের বিচিত্র অনুভূতি কে তুলে ধরে, নিম্নে কয়েকটি বিখ্যাত প্রেমের গানের পংক্তি তুলে ধরা হল : -

" তোমার আঁখির মতো আকাশের দুটি তারা, চেয়ে থাকে মোর পানে নিশীথে তন্দ্রাহারা, সে কি তুমি, সে কি তুমি......"

" মম মায়াময় স্বপনে, কার বাঁশি বাজে গোপনে, বিধুর মধুর স্বরে কে এলো, কে এলো সহসা, যেন স্নিগ্ধ আনন্দিত চন্দ্রালোকে ভরিল আকাশ হাসিল তমসা ....."

" তুমি আমার সকাল বেলার সুর , হৃদয় অলস করা অশ্রু ভারাতুর , ভোরের আলোর মতো তোমার সজল চাওযায়, ভালোবাসার চেয়ে সে যে কান্না পাওয়ার রাত্রি, শেষের চাঁদ গো তুমি- বিদায় বিধুর ...."

" শাওন রাতে যদি স্মরনে আসে মোরে, বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে.

" গহীন রাতে ঘুম কে এলো ভাঙাতে, ফুলহার পরায়ে গলে, দিলে জল নয়ন পাতে, যে জ্বালা পেনু জীবনে, ভুলেছি রাতে স্বপনে....." .

এইভাবে মানব জীবনে অনুভূত হয় নৈকট্যের অনির্বচনীয় অনুভূতি যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে রঞ্জিত করে মানুষের ভাবাবেগ ও তার বহিঃপ্রকাশ ফুটে ওঠে তার কর্মশৈলীতে ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অনবদ্য উপকরণ হিসেবে ।

বিরহ : বিরহ একটি বাংলা শব্দ যার অর্থ বিচ্ছেদ বা একাকীত্ব। এটি সাধারণত প্রেম, বন্ধুত্ব বা অন্য কোন সম্পর্কে বিচ্ছেদ বা বিচ্ছেদজনিত বেদনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বিরহ, বাংলা সাহিত্যের সংগীত ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা প্রায়শই দুঃখ-কষ্ট এবং একাকিত্বের অনুভূতি প্রকাশ করে। এমনকি প্রাত্যহিক জীবনে বিরহ একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে বিরহ মানব জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার প্রকাশ অন্তরমুখী বা বহিঃমুখী অথবা দুই প্রকার হতে পারে। স্বল্প সময়ের

জন্য যে বিচ্ছেদ বা বিরহ তার প্রতিঘাত সামান্য হতে পারে কিন্তু দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদ বা বিরহের প্রতিঘাত অতি সংবেদনশীল ব্যক্তির পক্ষে ভয়ংকর হতে পারে। সময় আর দূরত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি সত্ত্বার(ব্যক্তি) বিচ্ছেদ বা বিরহ বেদনার অভিব্যক্তি কিভাবে প্রকাশ পাবে, তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। বিরহের যথাযথ পরিভাষা দেওয়া সম্ভব নয়। বিরহ কি দুই ব্যক্তি (সত্ত্বা) বা বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া বা দূরে সরে যাওয়া? একা থাকার অনুভূতি, যা মানসিক কষ্ট নিয়ে আসে? বিরহ কি সম্পর্ক ছেদের কারণে সৃষ্ট ও মানসিক যন্ত্রণা বা এর সবগুলির মানব মনের উপর মিশ্র প্রতিক্রিয়া, তা বলা কঠিন।

বিরহ মানব জীবনের এক অবিচ্ছেদ অধ্যায়। কালের অমোঘ নিয়মে বিচ্ছেদ বিরহ নানা রূপে ও ভিন্ন -ভিন্ন অভিঘাত নিয়ে মানব জীবনে প্রকট হয়। বিরহ স্বল্পকালীন, দীর্ঘকালীন বা চিরকালের জন্য হয়। বিরহ সর্বদা কি মানব হৃদয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে? না এর কোন আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আছে? চির বিচ্ছেদ বিরহের এক অন্তিম পরিণতি যা ভৌতিক ভাবে মৃত্যুর সঙ্গে শেষ। বিরহ জীবন নাট্যের এক করুন দৃশ্যপট হলেও এটি অনেকের মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে, আত্ম উপলব্ধি বাড়ায় এবং সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

বিরহ ও বাংলা সাহিত্য- বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে কবিতা ও গানে বিরহের বিভিন্ন দিক গুলি তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ প্রমূখ কবিরা তাদের নিজ নিজ রচনাায় বিরহের গভীর অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাহিত্য সৃষ্টি একটি কলা আর এর সঙ্গে জুড়ে আছে, স্থান, কাল,পাত্র, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপট আর সর্বোপরি কবি বা লেখকের স্বীয় প্রতিভা আর ব্যক্তিগত জীবনের ঘাত প্রতিঘাত।

রবীন্দ্রসংগীতে বিরহ বিচ্ছেদের গভীর অনুভূতি প্রেমিকার বিরহ,প্রকৃতির বিরহ ও আধ্যাত্বিক বিরহ বিষয়গুলির প্রাধ্যান্য পেয়েছে| এই গানগুলিতে প্রিয়জনের অনুপস্থিতি, একাকিত্ব এবং অনন্ত বিচ্ছেদের বেদনা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে| প্রেম ও প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের বহু গান রচিত হয়েছে যেখানে বিরহের বেদনা এক নুতন মাত্রা পেয়েছে|

>প্রকৃতি বিরহ- প্রকৃতির সাথে মানুষের একাত্মতার অনুভূতি আর সেই প্রকৃতির একাকিত্ত বা বিচ্ছেদকে ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে ফুটিয়ে তুলেছেন|

>প্রেমের বিরহ- প্রিয় জনের কাছ থেকে দূরে থাকার বেদনা,বিচ্ছদের কষ্ট ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা এই গানগুলির প্রধান বিষয় অধ্যাত্মিক বা আত্মিক বিচ্ছেদের অনুভূতি| যেখানে মানুষ ঈশ্বর বা পরম স্বত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন্য হয়ে পড়ে .তাকে পাবার জন্য ব্যকুল হয়ে পড়ে |সেই অনুভুতির প্রকাশ অনেক গানে আছে |নিম্নে কয়েকটি গানের পংক্তি উল্লেখ করা হল|

আধ্যাত্মিক বা আত্মিক বিচ্ছেদের অনুভূতি: যেখানে মানুষ ঈশ্বর বা পরম স্বত্বা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতার গভীর অনুভূতি অনেক গানে আছে।

নিম্নে কয়েকটি গানের পংক্তি উল্লেখ করা হল।

"তুমিতো সেই যাবে চলে, কিছু তো না রবে বাকি, আমায় ব্যাথা দিয়ে গেলে, জেগে রবে সেই কথা কি? তুমি পথিক আপন মনে এলে আমার কুসুম বনে, চরণপাতে যা দাও দলে, সে সব আমি দেব ঢাকি ……."

"অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে, আজি শ্যামল মেঘের মাঝে,বাজে কার কামনা, চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়, ক্রন্দন তার কার গানে ধ্বনিছে , কে সে বিরোহী বিফল সাধনা …."

"মনে রবে কি না রবে আমারে, সে আমার মনে নাই মনে নাই,ক্ষনে ক্ষনে আমি তব দুয়ারে, অকারণে গান গাই, চলে যায় দিন যতক্ষন আছি পথে যেতে যদি আমি কাছাকাছি ….."

"আমার যাবার বেলা পিছু ডাকে, ভোরের আলো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে, বাদল প্রাতে উদাস পাখি উঠে ডাকে, বনের গোপন শাখে শাখে …."

*আমি রূপে তোমায় ভুলাবো না ভালবাসায় ভোলাব, আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাবো, ভরাবো না ভূষণ ভারে, সাজাব না ফুলের হারে, সোহাগ আমার মালা করে গলায় তোমার দোলাব...."

কবি নজরুল ইসলাম তাঁর গানে আরবি, ফার্সি, সংস্কৃত ও তৎসম শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষার এক অনবদ্য ভাষা রীতি তৈরি করেছেন .এই গানগুলিতে তিনি বিচ্ছেদ, ও প্রিয়জনের অনুপস্থিতির যন্ত্রণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন যা বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এক অনবদ্য সংযোজন .এই গান গুলিতে আছে গভীর আবেগ ও হৃদয় অনুভূতি .উদাহরণ স্বরূপ কিছু গান -

"শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে,বাহিরে ঝড় বহে ,নয়নে বারি ঝরে ,ভুলিও স্মৃতি মম ,নিশীথ -স্বপন সম, আঁচলে গাঁথা মালা ফেলিও পথ পরে....."

"জনম -জনম গেলো আশা-পথ চাহি, মরু মুসাফির চলি, পার নাহি নাহি, বরষ পরে বরষ আসে যায় ফিরে ,পিপাসা মিটায়ে চলি নয়নের নীরে ......"

"সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমায় ছুঁইয়া ছিলে, অনুরাগ কুমকুম দিলে দেহ মনে, বুকে প্রেম কেন নাহি দিলে? বাঁশি বাজায়ে লুকালে তুমি কোথায়, যে ফুল ফোটালে সে ফুল শুকায়ে যায় …….."

"নয়ন ভরা জল গো তোমার, আঁচল ভরা ফুল,ফুল নেবনা অশ্রু নেব ভেবে হই আকুল ,ফুল যদি নিই তোমার হাতে ,জল রবে গো নয়ন পাতে ,অশ্রু নিলে ফুটবে না আমার প্রেমের মুকুল ......"

"শুন্য বুকে পাখি মোর আয় ফিরে আয়,ফিরে আয় ,তোরে না হেরিয়া সকালের ফুল অকালে ঝরিয়া যায় ….."

সোনার তরী কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তি বিরহ এখানে আকাঙ্ক্ষা ও বিচ্ছেদের দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হয়েছে।"যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে"- প্রিয়জনের স্মৃতি এবং বর্তমানে শূন্যতা নিয়ে এক গভীর বিরহের ব্যঞ্জনা ব্যক্ত হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় প্রকৃতির নান্দনিক রূপ বর্ণনায় প্রেক্ষাপটে বিরহের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে, যা পাঠককে এক ভিন্নজগতে নিয়ে যায়। এখানে আছে সময়ের প্রবাহ, মৃত্যুচেতনা, নিঃসঙ্গ এক উপস্থিতির (existentiality) আভাস উদাহরণস্বরূপ কিছু কবিতা ও পংক্তি -

"বনলতা সেন" - এই কবিতায় প্রেম ও বিরহের যে মিশ্রণ দেখা যায় তা জীবনানন্দের অন্যতম সেরা সৃষ্টি। এখানে অতীতের স্মৃতি ও বর্তমানে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা উভয়েই প্রকাশিত হয়েছে।

"আধার খুঁজির বুকে ঘুমায় এবার
কোনদিন জাগিবে না আর "

এই পংক্তিটি গভীর এক আক্ষেপ এক অন্তহীন বিরহ ও জাগতিকতার প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। "রূপসী বাংলা" –এই কাব্যগ্রন্থে বাংলার নিঃস্বর্গ শোভা বর্ণনার মাধ্যমে এক সূক্ষ্ম বিরহ ও অতৃপ্তির সুর ফুটে উঠেছে। জীবনানন্দের বিরহ ব্যক্তিগত পরিসর ছাড়িয়া সার্বজনীন একাকীত্ব, সময়ের প্রবাহে হারিয়ে যাওয়া এবং অস্তিত্বের এক নিগুঢ় বেদনার প্রতিচ্ছবি, যা প্রকৃতির চিত্রকল্পের মধ্যে প্রকাশিত।

লোক সাহিত্য : লোক সাহিত্য ও লোকসঙ্গীতে বিরহের প্রকাশ পাওয়া যায়। সুকান্ত ভট্টাচার্যের অবাক পৃথিবী এই কবিতায় সমাজের প্রতি এক ধরনের হতাশা ও একাকিত্বের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যা বিরহের অনুভূতি জাগায়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহ: বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহ বলতে রাধা ও কৃষ্ণের মিলনের পূর্বে তাদের মধ্যে যে গভীর বিচ্ছেদ ও মানসিক কষ্ট দেখা যায় তাকে বোঝানো হয়। এটি বৈষ্ণব পদাবলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা মিলনের পূর্বের আকুতি, প্রেম ও অনুরাগকে তীব্র করে তোলে এবং শৃঙ্গার রসের বিপ্র লম্ভ নামক ভাব এক চমৎকার রূপ ফুটিয়ে তোলে। বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। এর মধ্যে প্রধান হল পূর্ব রাগ (মিলনের আগের বিচ্ছেদ) মান,(প্রেমে অভিমান) প্রেম বৈচিত্র (বিরহ ও মিলনজনিত জটিলতা) এবং প্রবাস (দূরে থাকার কারণে সৃষ্ট বিরহ)।

বিরহের মূল বৈশিষ্ট্য: বিরহ সুরের মাধ্যমে বৈষ্ণব পদাবলীতে বাৎসল্য, অনুরাগ এবং মিলনের পদগুলির মাধুর্য ও গভীরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারী কেন্দ্রিকতা: বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহের আবেগ মূলত রাধার দিক থেকেই প্রকাশিত হয়, যেখানে কৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে রাধার মানসিক যন্ত্রণা ও আকুতি তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে।
বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা কৃষ্ণের প্রেমকে মর্ত্য জীবনের প্রেমের প্রতীক হিসেবে দেখা হয় তাই বিরহ এখানে কেবল শারীরিক বিচ্ছেদ নয়, বরং জাগতিক বা আধ্যাত্মিক জীবনে ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বেদনাকেও বোঝায়। উদাহরণ যদুনাথ দাসের পদাবলীতে কৃষ্ণের মথুরা বাসের পর রাধার গভীর বিরহের বর্ণনা আছে যেখানে তিনি উন্মাদের মত বিলাপ করেন।
"ওরে রে মদন তুমি বিজয়া সংসারে, তোমার বিষম বাণ কে সহিতে পারে। আমাকে মারিয়া গেল মধুপুরি মরাকে মারিয়া তোর কিসের চাতুরি।"
রাধামোহন ঠাকুরের পদে মান বিরহে প্রতি বিরহে কাতর রাধার আক্ষেপ ও দুঃখের প্রকাশ পাওয়া যায়।

"খেনে খেনে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে
খেনে খেনে হরি মুখ চাহো
খেনে খেনে মন হি করত জানি ইছন
কানু সনে জীবন যাহ।"

উপসংহার: মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়। বৈচিত্র্যময় মানুষের হৃদয় বা মন। এই হৃদয়রূপী মহাসমুদ্র সদাচঞ্চল ও বেগবান। পারিপার্শ্বিক ঘটনা প্রবাহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হৃদয়ে সঞ্চারিত হয় নানান ভাবাবেগ- কখনো সুখের, কখনো দুঃখের, কখনো প্রেমের, কখনো বিরহের আর এই ভাব অনেক, অনেক দূর, ভাবালোক বা ভাবজগতে বিস্তৃত হয়। এই ভাবালোকে নৈকট্য ও বিরহ এক অতি প্রাকৃত রূপ পরিগ্রহ করে স্বর্গীয় বা ঈশ্বরিক মহিমায় দীপ্তমান হয়। নৈকট্য কি আনে প্রেম অথবা প্রেম আনে কি নৈকট্য?
অন্যদিকে দুটি সত্ত্বার (নর ও নারী) মধ্যে ভৌতিক দূরত্ব কি বিরহ অথবা নৈকট্যের মাঝে লুকিয়ে আছে বিরহ? এ সবের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বাস্তবিক রূপে কঠিন। জন্ম লগ্নের শুভ মুহূর্ত থেকে আমৃত্যু মানব জীবনে অহরহ চলছে নৈকট্য আর বিরহের দ্বন্দ্ব —আমি আছি! আমি নেই! এই যে দেখছো রাত, এখানে আমার রোমকূপের গল্প নেই, এই যে দেখছো- আমার রোমকূপ, আমার শরীরের মানচিত্র, অলিগলি, আমার রক্তনালীতে লাগামহীন উত্তেজনা, টগবগ দাবানল ছুটন্ত ঘুমন্ত জীবন, অবিরাম ফোসফাঁস নিঃশ্বাস! এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, এদের কারো ভিতর আমি নেই। আমার চোখের জলের ভাষায়, আমার কন্ঠে ধ্বনিত বাক্যে, আমার বেহিসাবি স্পর্শে, আমার শরীরের উত্তাপে, গায়ের ঘামাতে, গন্ধে কোথাও আমি নেই। আমি আছি আমার ক্ষুধায়, আমার লোভে, আমার তৃষ্ণায়, আমার আকাঙ্ক্ষায়, অনুভূতিতে আমি আছি। আমার ভালোবাসায়, আমার মঙ্গলা গায় আমার প্রেমে আমার ঘৃণায়। আনন্দে আশায় হতাশায় আমার চেপে বসা যন্ত্রণায়। আমার খোলা জানালার ফাঁক গলে আসা বেসামাল হাওয়ায়। বিছানায় লুকিয়ে পড়া চাঁদের আলোয় আমি আছি। এখন দীর্ঘ রাতের দীর্ঘ নিঃশ্বাস - আমি আছি। এই কি জীবন, নৈকট্য ও প্রেম? বিরহ আর যন্ত্রণা? পাওয়া আর না পাওয়ার খেলা চলে অহরহ! নির্বিকার সৃষ্টিকর্তা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে।

.

মানবতার প্রতীক কাজী নজরুল ইসলাম

অশোক বিশ্বাস

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সঙ্গীত জগতে কাজী নজরুল ইসলাম হচ্ছেন অন্যতম স্রষ্টা যিনি রবীন্দ্রনাথের যশোমন্ডলের মধ্যে থেকেও সৃষ্টি করেছিলেন স্বকীয় রচনাভঙ্গি। নজরুলের সৃষ্টির মূল দুই বিচরণক্ষেত্র সাহিত্য ও সঙ্গীত। নজরুল ছিলেন স্বভাবে বিদ্রোহী ও সাম্যবাদী। তাঁর বিদ্রোহ ছিল শোষক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ছুঁৎমার্গী সমাজপতিদের বিরুদ্ধে, ধর্মীয় ভন্ডামীর বিরুদ্ধে। নজরুল ইসলাম মন থেকে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বলেই, আজীবন নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছিলেন। তাঁর চেতনার মুলে ছিল মানবপ্রেম, মানবিকতাই ছিল তাঁর ধর্ম। সারা জীবন তিনি মানুষেরই জয়গান গেয়েছেন । বর্তমান সময়ে বিশ্ব জুড়ে প্রতি মুহূর্তে মানবতার লাঞ্ছনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তাই এই সঙ্কটকালে কাজী নজরুল ইসলাম অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । নীতিহীন, আদর্শহীন আজকের এই অশান্ত সময়ে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টির চর্চা আরও বেশি করে প্রয়োজন। বর্তমানে দিকভ্রান্ত নবীন প্রজন্মকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারেন তিনি। বর্তমান সময়ে তাঁর সৃষ্টিসম্ভারকে অনুশীলন করা অতি আবশ্যক বলে মনে হয়।

নজরুলের জীবন দর্শন

নজরুল সংস্কৃতি ও জাতি নিয়ে চর্চা করতে গিয়ে দেখেছেন দুইয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বৈপরীত্য। তিনি সমাজের অভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করেছিলেন অজস্র ভণ্ডামি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন লুকানো শাণিত ছুরি, তথাকথিত নিরপেক্ষ ব্রিটিশ বিচার ব্যবস্থার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন হিংস্র কদর্যতা। নজরুলের চেতনায় ছিল নিপীড়নের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সব বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ । তাই তিনি লিখেছেন -- *"আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না / অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রনিবে না / বিদ্রোহী রণক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত।"*

নজরুলের বিদ্রোহ ছিল মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও সাম্যের পক্ষে। নজরুলের সাম্যবাদ ছিল তার দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু। তার কবিতা, গান ও গদ্যে বারবার উঠে এসেছে ধর্ম-বর্ণ-জাতপাত নির্বিশেষে মানুষের মর্যাদা ও সমতার কথা। নজরুল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও জাতিভেদের চরম বিরোধিতা করেছেন। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ, ধনী- দরিদ্র বৈষম্য বা নারী-পুরুষের অমর্যাদা - সবকিছুর বিরুদ্ধেই গর্জে উঠেছে তার লেখনী । নজরুল তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্ম ও পরাধীন দেশবাসীর

চিন্তা ও চেতনার মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন। তার সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন 'কালী কালী বলো রে আজ কালীর নাম' এবং 'ও মন রমজানেরই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' উভয়ই। এই ভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয়কের কাজ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু বাধার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের জীবন দর্শন বদলাননি । তিনি তাঁর সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য সৃজনে মানুষে মানুষে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও মিলনের বার্তা দিয়ে গিয়েছেন ।

নজরুলের বিপ্লবী চিন্তাচেতনা

ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের ২০০ বছরের শাসনকালের শেষ দিকে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবৎকালে বিশ্বের অনেক দেশই ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। ব্রিটিশদের নিপীড়ন ও শোষণমূলক ক্ষমতার আস্ফালন তখন বিশ্ব জুড়ে প্রকট। তখন সমগ্র বিশ্বের পরিস্থিতি ছিল ভারসাম্যহীন। একদিকে নিপীড়িত মানুষের সীমাহীন সমস্যা, অন্যদিকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে । সর্বত্র যুদ্ধংদেহী মনোভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র এবং জনগোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলছিল সারা বিশ্ব জুড়ে। ছোটবেলাতেই থেকেই নজরুল তেজস্বি ও প্রতিবাদী ছিলেন। তাৎক্ষণিকভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন তিনি । তিনি দুঃখী ও নিপীড়িত মানুষের সঙ্গী ছিলেন । তিনি গান ও কবিতার মাধ্যমে তাঁর বিপ্লবী চেতনা যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকখানি ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। নজরুল তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের অসংগতি এবং বৈপরীত্যসমূহ সহজেই ধরে ফেলতে পারতেন । দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী চিন্তাচেতনা থেকে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি।

সৈনিক থেকে বিদ্রোহী কবি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে, বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে ছিলেন । তার বাবা কাজী ফকির আহমদ ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম, নজরুলের বয়স যখন নয় বছর তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারে চরম অভাব অনটন দেখা দেয় তাই বালক নজরুলকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আয় করার চেষ্টা করতে হয়ে ছিল । তিনি ১৯১০ সালে প্রাথমিক পরীক্ষায় পাশ করেন, এবং পাশ করার পর পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী হওয়ায় জন্য নজরুল সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ পেয়ে যান। সেই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক মৌলবী কাজী ফজলে আহম্মদের কাছে তিনি নিজের আগ্রহে আরবি ও ফারসি ভাষা শিখে নেন। কিন্তু সেই শিক্ষকতার কাজ খুব বেশি দিন তিনি করতে পারেননি।

তিনি একসময় চা-রুটির দোকানেও কাজ করেছেন। সেই দোকানে নজরুলের কাজকর্ম, বিস্ময়কর প্রতিভা ও মননশক্তি দেখে আসানসোলের দারোগা জনাব রফিজউল্লা মুগ্ধ হন। তিনি নজরুলকে স্কুলে ভর্তি করে দেন ও নিজের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন। বিনিময়ে পড়াশোনার পাশাপাশি নজরুলকে দারোগা সাহেবের বাড়ির কিছু কাজও করতে হতো ।মাইনে পেতেন মাসে পাঁচ টাকা। অভাব ও অন্যান্য কারণে কৈশোরে নজরুলকে বার বার স্কুল বদলাতে হয়েছিল। তিনি কখনো আসানসোল, কখনো রানীগঞ্জ আবার কখন ময়নসিংহের স্কুলে পড়েছেন । স্কুল জীবনের শেষে দিকে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল অবধি তিনি রানিগঞ্জের সিয়ারসোল রাজস্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে ছিলেন । কিন্তু ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত আর দেওয়া হয়নি । কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ সালের শেষ দিকে সেনাবাহিনীর ৪৯ নম্বর বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন । উদ্দেশ্য ছিল পরিবারের আর্থিক অনটনের কিছুটা সুরাহা করা। স্কুল জীবনের মত সৈনিক জীবনেও কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলেন। পদোন্নতি পেয়ে 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার' হয়েছিলেন । সেনাবাহিনীতে কাজ করার সময় যুদ্ধবিদ্যা ছাড়া নজরুল উর্দু, হিন্দি, ফারসি ও আরবি ভাষা শেখেন সতীর্থদের কাজ থেকে। এছাড়া তিনি সংগীতানুরাগী সৈনিক বন্ধুদের সঙ্গে মিলে সংগীত চর্চাও করতেন ।

সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন অবসর পেলেই তিনি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন । লেখাগুলি তিনি ডাকযোগে কলকাতার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পাঠাতেন এবং সেগুলি পত্রিকাগুলিতে ছাপা হতো । করাচির সেনানিবাসে বসে নজরুল যে গল্প কবিতা ও প্রবন্ধ লেখেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - বাউন্ডুলের আত্মকাহিনী, মুক্তি, হেনা, ব্যথার দান, ঘুমের ঘোরে ইত্যাদি। নজরুল করাচীর সেনা ব্যারাকে থেকেও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীদের ওপর ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতন ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ে খবর রাখতেন। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয় । সেনার চাকরি শেষ হলে নজরুল ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন ও সমিতির সাহিত্য পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন।

স্কুল জীবন থেকে নজরুলের সাহিত্য পাঠের অভ্যাস ছিল । বঙ্কিম থেকে শরৎ ও রবীন্দ্র সাহিত্যের মনোযোগী পাঠক ছিলেন তিনি । ১৯২১ সালে অক্টোবর মাসে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয় এবং তখন থেকে প্রায় কুড়ি বছর এই দুই কবির মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। তারা দুজনে একে অপরকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন।

১৯২১ ও ১৯২২ সাল নজরুলের জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুটি বছর। ১৯২১ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে তিনি লেখেন কালজয়ী 'বিদ্রোহী' কবিতা ও "ভাঙ্গার গান' শিরোনামে - 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' গানটি । ১৯২২ সালে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে শুরু করে অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'। নজরুল ও তাঁর বন্ধু কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচারের লক্ষ্যে এই অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তৎকালীন বহু গুণী মানুষের শুভেচ্ছাবাণী প্রকাশিত হয়ে ছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লবী বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরীসুন্দরী ঘোষ, বীরজাসুন্দরী সেনগুপ্ত, সরোজিনী নায়ডুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু হয়েছিল এই কাগজের পথ চলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাণী 'ধূমকেতু'র প্রতিটি সংখ্যায় প্রকাশিত হতো। ধূমকেতুর সম্পাদকীয় ভাষ্য ছিল জ্বালাময়ী।

শোনা যায় পত্রিকাটি তরুণদের মধ্যে অভাবনীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রকাশের কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিক্রি হয়ে যেত সব কপি । প্রখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন, 'ধূমকেতু'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলো 'কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে লেখা' । সেই সম্পাদকীয়র একটি নমুনা উদ্‌ধৃত হলো -
"সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ মানি না।... ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীনে থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশে মোড়লি করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে।"

১৯২২ সালের ধূমকেতু'র শারদীয় সংখ্যায় নজরুল ইসলামের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতার প্রথম স্তবকে নজরুল মা দুর্গাকে নালিশের ভঙ্গিতে লেখেন: *"আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার/ মূর্তি-আড়াল/ স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী/ শক্তি-চাড়াল।/ দেবশিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের/ দিচ্ছে ফাঁসি/ ভূভারত আজ কসাইখানা—আসবি কখন/ সর্বনাশী?"* এই কবিতায় নজরুল ইঙ্গিতে সমকালীন রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকা ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লব ও বিদ্রোহের ইঙ্গিত পেয়ে ধূমকেতুর ওই সংখ্যা বাজেয়াপ্ত করে এবং রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলকে গ্রেপ্তার করে । কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর বিচারে নজরুলের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বিচারাধীন থাকাকালীন বিচারক তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নজরুল লেখেন তাঁর বিখ্যাত আত্মপক্ষীয় বয়ান 'রাজবন্দীর জবানবন্দী '।

প্রথমে কিছুদিন নজরুলকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তার রচিত 'বসন্ত' নাটক নজরুলকে উৎসর্গ করেন। একটা সাধারণ কয়েদিকে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ বই উৎসর্গ করেছেন শুনে তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন ইংরেজ জেলার ও পাহারাদাররা। কিছুদিন আলিপুর জেলে থাকার পর নজরুলকে হুগলি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয় । হুগলি জেলের রাজনৈতিক বন্দীরা বিদ্রোহী কবি নজরুলকে পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমি তাঁরা কাটিয়ে উঠেছিল। সেই সময়ে হুগলি জেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন আর্সটিন নামের এক ইংরেজ। আর্সটিন ছিল অত্যন্ত অভদ্র ও অত্যাচারী। রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে চোর, ডাকাত, পকেটমার কয়েদির মতো ব্যবহার করতো। রাজনৈতিক বন্দীদের চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ, কলম, পেন্সিলও দিতো না। রাজনৈতিক বন্দীরা যাতে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে না পারে, তাই তাঁদের আলাদা আলাদা দূরের সেলে রাখতো। কিছুদিনের মধ্যে সুগায়ক নজরুল কয়েদিদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন, সেলে বসে তিনি উচ্চকণ্ঠে গান ধরতেন: *"কারার ঐ লৌহ কপাট/ ভেঙে ফেল, কররে লোপাট/ রক্ত জমাট/ শিকল পূজার পাষাণ বেদী।/ ওরে ওই তরুণ ঈশান/ বাজা তোর প্রলয় বিষাণ/ ধ্বংস নিশান/ উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি।"* এইসব কার্যকলাপের জন্য শাস্তিস্বরূপ কবি নজরুল ও আরো কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে অত্যাচারী আর্সটিন হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি পরিয়ে সেলে রাখতে শুরু করে । কবি তখন শিকল ও হাতকড়া সেলের লোহার গারদের সাথে ঘা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে গাইতেন: *'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরার ছল/ এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।'*

অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে নজরুল সাধারণ কয়েদি ও রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদে অনশন শুরু করেন। জেল কর্তৃপক্ষ অনশনরত নজরুলকে নতুন নতুন শাস্তি দিয়েও নিরস্ত করতে পারেনি । উনচল্লিশ দিনের দীর্ঘ অনশনে কবি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলা জুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে জেল কতৃপক্ষ কিছুটা সংযত হয়। নির্যাতনের মাত্রা কিছুটা কম হওয়ার পর নজরুলের অনশন ভঙ্গ করেন । মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবী জেলে এসে নজরুলের অনশন ভঙ্গ করান। কবি তাঁর হাতে লেবুর রস পান করে অনশন ভঙ্গ করেন।

ব্রিটিশ সরকার হুগলি জেলের বন্দিদের উপর নজরুলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে তাকে বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে বসে তিনি বহু গান, কবিতা, প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন । সেই সব গান ও কবিতা গোপনে জেলের বাইরে চলে যেত ও কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতো। সেই কারণে প্রিজন অ্যাক্ট ভাঙার অপরাধে নজরুলের বিরুদ্ধে আর একটি মামলা হয়। ১৯২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর তাঁকে হাজির করা হয় বহরমপুরের সাব ডিভিসনাল ম্যাজিস্ট্রেট এন কে সেনের এজলাসে। বহরমপুরের প্রখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান আইনজ্ঞরা সওয়াল করেন। জোরালো সাওয়লে সম্মত হয়ে বিচারক ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর জেল থেকে নজরুলকে মুক্তি দেন। ।

কবি, গীতিকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও গায়ক নজরুল

দীর্ঘদিন বেঁচে থাকলেও সাহিত্যিক হিসেবে নজরুলের সৃষ্টিশীল জীবন ছিল মাত্র ২২ বছর। বাকি জীবন তিনি নীরব হয়ে বেঁচে ছিলেন । সেই সৃষ্টিশীল বাইশ বছরে তিনি অনেকগুলি উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও প্রায় আড়াই হাজার গান লিখেছিলেন ও তার সুর দিয়ে ছিলেন । নজরুল একদিকে যেমন বিদ্রোহের কাব্যগ্রন্থ অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশি, প্রলয় শিখা ইত্যাদি রচনা করেছিলেন তেমনি দোলন চাঁপা, চক্রবাক, ছায়ানট, পুবের হাওয়া ইত্যাদি প্রেমের কাব্যও সৃষ্টি করেছিলেন, লিখেছিলেন শিশুদের জন্য বহু ছড়া ও কবিতা।

নজরুল তাঁর লিখিত সমস্ত গানের সুর নিজেই করেছিলেন । নিজের আগ্রহেই তিনি উত্তর ভারতীয় সংগীতের খেয়াল ঠুমরী, দাদরা, কাজরী, গজল, কাওয়ালী ইত্যাদি গানও শিখেছিলেন। এমনকি ইউরোপিয়ান,স্প্যানিশ, আরবিক গানও তিনি গাইতে পারতেন। বাংলা লোকগীতি, বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন, যাত্রা পালার গান, শ্রমিক দলের গানও তিনি জানতেন । তাই তাঁর গানের সুরে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। নজরুল গানের অন্তর্নিহিত ভাব ও ব্যবহৃত শব্দর সঙ্গে মানানসই সুর ব্যবহার করতেন। যেমন

'*চল চল চল, ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল*' গানে মার্চিং সং ও '*শুকনো পাতার নুপুর পায়ে*' গানে ইরানি গানের সুর ব্যবহার করেছেন, আবার '*আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়*' গানটিতে সনাতনী বাংলা গানের সুর অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন । নজরুলের চটপট গান লিখে তৎক্ষণাৎ সুর দেওয়ার দুর্‌লভ ক্ষমতা ছিল, তাই গ্রামাফোন কোম্পানিগুলি তাকে খুবই পছন্দ করতো। সর্বোপরি তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী, উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে তিনি সর্বত্র মানুষের মন জয় করে নিতেন।

কাজী নজরুল কলকাতার অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিওতে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন । তাঁর পরিচালনায় অনেক সঙ্গীত অনুষ্ঠান সেই সময় অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতাকে সমৃদ্ধ করেছিল। ১৯৪১ সালের ৭ই আগস্ট (২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে কাজী নজরুল রচনা করেন - '*ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবি রে, জাগায়ো না জাগায়ো না*', নজরুলের স্বকণ্ঠে গীত গানটি সরাসরি আকাশবাণী থেকে সম্প্রচারিত হয়েছিল ।

ব্যক্তি জীবন

নজরুল বর্ধমান জেলার আসানসোল জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালের ২৪ মে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল কাজী ফকির আহমেদ এবং মায়ের নাম ছিল জাহেদা খাতুন । তাঁর বাবা বাড়ির মসজিদের পাশে মুসলিম পরিবারের শিশুদের ইসলামি শিক্ষার জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন ও মাজারের তত্বাবধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। পারিবারিক আয় ছিল সামান্য । কিন্তু তাঁর বাবা কাজী ফকির আহমেদ ১৯০৮ সালে অল্প কিছুদিন রোগ ভোগের পর মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর পরিবারে চরম অভাব দেখা দেয় । তাই অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি তাঁর চাচা কাজী বজলে করিমের লেটো গানের (এক ধরণের কবিগান)দলে যোগ দেন। দলের জন্য তাঁর চাচা নিজেই গান লিখতেন। চাচার আরবি, ফার্সি আর বাংলা ভাষায় ভালই দখল ছিল। তাঁর কাছেই নজরুলের লেখালেখির হাতেখড়ি হয় । লেটো দলের জন্য নজরুল গান লিখতে শুরু করেন। এই সময় তিনি অনেক বাংলা, উর্দু, ফারসি ভাষা মিশ্রিত গীতিকাব্য, প্রহসন, পাঁচালী, কবিগান লেখেন। উল্লেখযোগ্য লেখা হলো: শকুনীবধ, রাজপুত্রের গান, মেঘনাদ বধ ইত্যাদি। তারপর একদিন চঞ্চল মতি নজরুল গানের দল ছেড়ে রাণীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে নজরুল নজরুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। কিন্তু পারিবারিক অভাব মেটাতে ব্রিটিশ সেনার বেঙ্গল রেজিমেন্ট দলে যোগ দিতে হয়, তাই তার পক্ষে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয়নি ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে সেনার বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল কলকাতায় চলে আসেন ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সাহিত্য পত্রিকার কাজে যোগ দেন। লেখালিখির গুণে সেই সময় কলকাতায় নজরুল খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন । সাহিত্য সমিতিতে কাজের সূত্রে আলী আকবর খান নামের এক প্রকাশকের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। প্রকাশক আলী আকবর খান তার প্রকাশনা সংস্থার ব্যবসায়িক স্বার্থে কুমিল্লায় নিয়ে গিয়ে নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবান সাহিত্যিক নজরুলের বিয়ে দিয়ে ঘর জামাই করার চেষ্টা করেন। বিয়ের আসরও বসে ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিয়ের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নজরুল বেঁকে বসেন ও বিয়ের চুক্তিপত্র সই না করে ঝড়-জলের রাতে বিয়ের আসর থেকে বিয়ে না করেই পালিয়ে যান। মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী সেনগুপ্ত তাঁকে বাড়িতে আশ্রয় দেন । সেখানে পৌঁছে নজরুল খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ নজরুলের শুশ্রুষা করার দায়িত্ব পড়ে বিরজাসুন্দরী দেবীর সর্বক্ষণের সঙ্গী দেওরের মেয়ে আশালতার ওপর। আশালতার সঙ্গ কবির মন কাড়ে, ধীরে ধীরে তা ভালোবাসার রূপ নেয়। সুস্থ হয়ে নজরুল কলকাতায় ফিরে যান। কিন্তু ওই বছরেই আশালতার টানে তিনি আবার কুমিল্লায় ফিরে আসেন ও সেখানে এক মাস থেকে যান। নজরুল আশালতাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন। বিরজা সুন্দরী দেবী সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু আশালতা দেবীর বিধবা মা গিরিবালা দেবী সেই বিয়েতে রাজি ছিলেন । তাই মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল কলকাতায় মেয়ের বিয়ে দেন নজরুলের সঙ্গে। বিয়ের সময় নজরুলের বয়স ছিল ২৩ বছর ও আশালতার বয়স

ছিল ১৬ বছর। উদারপন্থী নজরুল বিয়ের আগে বা পরে স্ত্রীকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেননি। বিয়ের পর নজরুল স্ত্রীর নতুন নাম দেন প্রমীলা। প্রমীলা স্বভাবে সরল, নম্র-ভদ্র ও বিদুষী ছিলেন। ছন্নছাড়া ও আবেগপ্রবণ নজরুলের সংসারের হাল তিনি ধরে ছিলেন শক্ত হাতে ।

কিন্তু কাজী নজরুলের সাংসারিক জীবন ছিল বেদনায় জর্জরিত। নজরুলের প্রথম সন্তান কৃষ্ণ মহম্মদ ও দ্বিতীয় সন্তান বুলবুল খুব অল্প বয়সে মারা যায় । মাত্র ৩০ বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে প্রমীলাদেবী ও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। স্ত্রীর রোগ সারানোর জন্য নজরুল প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও কোনো লাভ হয়নি। সন্তানদের মৃত্যু ও অল্প বয়সে স্ত্রীর অসুস্থতার কারণে আবেগপ্রবণ কবিকে চরম মানসিক যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়েছিল । তাঁর জীবিত দুই পুত্র আবৃত্তিকার কাজী সব্যসাচী এবং খ্যাতনামা গিটারবাদক কাজী অনিরুদ্ধ স্বক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিভার সাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই রাতে অল ইন্ডিয়া রেডিওর কলকাতা বেতারকেন্দ্রে শিশুদের এক অনুষ্ঠানে পরিচালনা করছিলেন নজরুল। অনুষ্ঠান চলাকালীন এক সময় তাঁর জিভ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে । অনেক চেষ্টা করেও সেদিন আর কথা বলতে পারেননি তিনি । সেদিন রাতে অসুস্থতার কারণে কিছুই খেতে পারেননি। ধীরে ধীরে তার অসুস্থতা আরো বাড়তে থাকে । এক সময় তিনি বাকশক্তি পুরোপুরি হারিয়ে ফেলেন । বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছিল বিদ্রোহী কবির চিকিৎসার খরচ বহন করতে । সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে দেশে বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্রে তাঁকে সুস্থ করার চেষ্টা করা হয়েছিল । ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয় । স্বাধীন ভারতে ১৯৫২ সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, কাজী আবদুল ওদুদ, অতুল গুপ্ত প্রমুখের নেতৃত্বে তাঁর চিকিৎসার খরচ চালিয়ে যাওয়ার জন্য গঠিত হয় 'নজরুল নিরাময় সমিতি'। দেশে বহু রকম চিকিৎসায় রোগ নির্ণয় সম্ভব না হাওয়ায়, ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে চিকিৎসা জন্য বিদেশে পাঠানো হয়। ইউরোপের বহু দেশে বহু চেষ্টার পর ভিয়েনাতে চিকিৎসকরা আবিষ্কার করেন যে 'পিকস ডিজিজ' নামের নিউরনঘটিত এক বিরল মস্তিষ্কের রোগে ভুগছেন নজরুল। এই রোগে মস্তিষ্কের সামনের ও পাশের অংশগুলো সংকুচিত হয়ে যায়, যার চিকিৎসা সম্ভব নয় । তাই তিনি জীবনের বাকি ৩৪ বছর নির্বাক অবস্থাতেই বেঁচে ছিলেন ।

১৯৭২ সালে ভারত সরকার, বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ অনুরোধে পরিবারসহ কাজী নজরুল ইসলামকে বিশেষ ব্যবস্থায় বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় । সেখানে ১৯৭৬ সালে তাঁকে সন্মান জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে সেই দেশের নাগরিকত্ব দেয়, কিন্তু ওই বছরই ২৯শে আগস্ট বিদ্রোহী কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

উপসংহার

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে এক নতুন যুগ শুরু করেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই নজরুল বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জগৎ ও জীবনের প্রতি চরমভাবে আস্থাশীল। তবে তৎকালীন কবিরা রবীন্দ্রপ্রভাবিত কাব্যজগতে নিজেরা এক স্বতন্ত্র কবিসত্তা গড়ে তোলার ও প্রভাব মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু কাজটি বড় সহজ ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য একটি অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। এই যুদ্ধ ভারতীয়দের মনে স্বশাসন, সাম্য এবং স্বাধীনতার আকাঙ্খা বাড়িয়ে তোলে। এমন সময়ে বাংলা সাহিত্যের জগতে তরুণ কবি ও গীতিকার নজরুলের আবির্ভাব ঘটে উল্কার বেগে । নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা রাতারাতি বাঙালির মনে পরাধীনতা থেকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা জাগিয়ে তোলে।

নজরুল তার লেখা গান ও কবিতায় ভারতবাসীর শৃঙ্খল মুক্তির কথা বলেন, নারী-পুরুষ, কৃষক-মজদুরের সমান অধিকারের কথা দাবির আকারে পেশ করলেন। তার সাহিত্যের ভাষায় না ছিল কোনো আভিজাত্য, না ছিল কোনো দুর্বোধ্যতা। তা ছিল দলিত ও অত্যাচারিতের ভাষা। তাঁর বিদ্রোহ ছিল শোষণ, অন্যায়, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। দেশপ্রেমিক নজরুল সমাজের নিচু তলার মানুষের আত্মাকে উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তিনি তাদের কথা সোচ্চার কন্ঠে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে নজরুলের দর্শন, চেতনা ও বিশ্বাসকে ধারণ ও লালন

করা অত্যন্ত অত্যাবশ্যক। তিনি সবসময়ই চেয়েছিলেন মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ও ধর্মীয় সংস্কৃতির অচলায়তন ভেঙে ফেলতে। তাই যতদিন পৃথিবীতে শাসকের অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, নির্যাতন থাকবে; সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পুঁজিবাদী আগ্রাসন চলবে, ধর্মীয় সন্ত্রাস মানুষের মুক্ত চেতনাকে রুদ্ধ করবে, ততদিন নজরুলের প্রতিবাদী চেতনা আমাদের আলোর পথ দেখাবে।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে চিরজীবনের জন্য বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার আগে ১৯৪১ সালে এক সম্বর্ধনা সভায় তাঁর সর্বশেষ "অভিভাষণ" এ তিনি জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন তাঁর জীবনের কষ্ট, পূর্ণতাও, অপূর্ণতাও, প্রেম, বিদ্রোহের কথা। সেই "অভিভাষণ" এর কিছু অংশ এই প্রবন্ধের শেষে উদ্‌ধৃত করে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানালাম - "আমি বিদ্রোহ করেছি বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে।যা মিথ্যা কুলুষিত পুরাতন পঁচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভন্ডামী ও কুষ্কারের বিরুদ্ধে। কেউ বলেন, আমার বাণী যবন কেউ বলেন কাফের, আমি বলি ও দুটোর কোনোটাই নই আমি, কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যান্ডসেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি .... হিন্দু-মুসলমানে দিন-রাত হানা-হানি জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ যুদ্ধ বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র-ঋন- অভাব, অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষান স্তুপের মত জমা হয়ে আছে। এই অসাম্য ভেদ জ্ঞানকে দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সংগীতে কর্মজীবনে অভেদ সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। আমি যশ চাইনা খ্যাতি চাইনা প্রতিষ্ঠা চাইনা নেতৃত্ব চাইনা। জীবন আমার যত দুঃখময়ই হোক আনন্দের গান, বেদনার গান গেয়ে যাব আমি। দিয়ে যাব নিজেকে নিঃশেষ করে সকলের মাঝে বিলিয়ে, সকলের বাঁচার মাঝে থাকবো আমি বেঁচে। এই আমার ব্রত এই আমার সাধনা এই আমার তপস্যা।" (কাজী নজরুল ইসলাম সৃষ্ট 'যদি আর বাঁশি না বাজে' শীর্ষক অভিভাষণ থেকে উদ্‌ধৃত)

বিজ্ঞান

টুকরো বিজ্ঞান: এটা কী, ওটা কেন?

কৃষ্ণেন্দু দাস

সেই ছোটবেলা, জ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে, আজীবন মানুষের মনে অফুরন্ত জিজ্ঞাসা ; সঙ্গে অজানাকে জানার; আর অদেখাকে দেখার ইচ্ছা থাকে। এই প্রবণতা মানুষকে গড়ে তুলেছে এক অন্যন্য রূপে। জ্ঞান, বিজ্ঞান , সাহিত্য, কলা- সবেতে তার আগ্রহ, জ্ঞানলাভের আর উন্নত জীবন যাপনের। কিন্তু সমাজে জ্ঞান আহরন আর বন্টনের মধ্যে এতো জটিলতা যে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। কিন্তু সাধারণের পক্ষে বিজ্ঞানের জটিল ব্যাপারগুলি রপ্ত করা সহজ নয়। বিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি সাধারণ জিজ্ঞাসা ও তার যথাযথ উত্তর ও জীবনের সঙ্গে এগুলি কতটা জড়িত, সে সমস্ত ব্যাপারে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

১) *পেপটিক আলসার হলে বারে বারে অল্প অল্প করে খাওয়া কি ঠিক?*

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এরকম উপদেশ দেওয়া হয় না বা দেওয়া হলে সেটা ঠিক হবে না। আগে রোগীকে বারে বারে অল্প অল্প খেতে বলা হত। তখন ধারণা ছিল যে একেবারে খুব বেশি খেলে পাকস্থলীতে বেশি পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ক্ষরণ হবে, সেটা রোগীর পক্ষে ক্ষতিকারক। অল্প পরিমাণে খেলে অম্লক্ষরণ কম হবে এবং যেহেতু খাদ্যদ্রব্য ক্ষরিত অম্লকে লঘু করে দেয় সেজন্য বারে বারে খেলে এই লঘু করার কাজটা বারে বেশি হবে এবং রোগীর উপকার হবে। কিন্তু বর্তমানে এই ধরনের রোগীকে স্বাভাবিক আহার স্বাভাবিক বারে খেতে বলা হয়। কারণ এতে বারে বারে অল্প পরিমাণে খাওয়ার সঙ্গে কোনো উল্লেখযোগ্য তফাত লক্ষ্য করা যায় নি। খালি পেটে অম্লক্ষরণ কম হয় এবং খেলে পরে অম্লক্ষরণ বাড়ে এবং এটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে । যতবার খাওয়া যাবে ততবার ক্ষরণ বৃদ্ধি ঘটবে। যদিও খাদ্যদ্রব্য অম্লকে লঘু করে তবুও বারে বারে খেলে মোট যে অম্লবৃদ্ধি ঘটবে তার পরিমাণ হবে অনেক বেশি। এজন্য আজকাল পেপটিক আলসারের রোগীকে বারে বারে খেতে না বলে স্বাভাবিকভাবে আহার করতে উপদেশ দেওয়া হয়। দুধ খেলে পাকস্থলীর অম্ল সাময়িকভাবে লঘু হলেও পরবর্তী সময়ে দুধের ক্যালসিয়ামের প্রভাবে অম্লক্ষরণ বেশি পরিমাণে হয় । এজন্য পেপটিক আলসারের রোগীকে আজকাল দুধ না খেতে উপদেশ দেওয়া হয়।

২) *বদহজম বা অজীর্ণ হলে, কিংবা ঐ জাতীয় পেটের গোলমালে অনেকে দু-এক চামচ খাবার সোডা খেয়ে নেন। এরকম অভ্যাস কি ভালো, নাকি এতে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে?*

আমাদের শরীরে অম্লের একটা নির্দিষ্ট মাত্রা সবসময় বজায় থাকে। এর একটু-আধটু হের-ফের শরীর নিজেই মানিয়ে নিতে পারে। তবে যখন টক টক ঢেকুর ওঠে তখন বুঝতে হবে পেটের অম্লের মাত্রা বেশ বেড়েছে। এই অতিরিক্ত অম্লতা কমাতে ক্ষারজাতীয় জিনিসের দরকার হয়। তবে সেই ক্ষারের মাত্রা বেশি হলে আবার ক্ষতি হয়। অতিরিক্ত ক্ষার দেহের ভেতরকার বিভিন্ন কোষের দেওয়ালে আক্রমণ করে ক্ষয় করে দেয়। চিকিৎসকরা অল্প পরিমাণে যে ওষুধ দেন, তাতে ক্ষারের মাত্রা সহন ক্ষমতা অনুযায়ী থাকে। কিন্তু ঘরোয়া টোটকা হিসেব যে খাবার সোডা খাওয়া হয় তার ফল মারাত্মক হতে পারে, সেখানে পরিমাণ ঠিক করে থাকে না। খাবার সোডাতে থাকে সোডিয়াম বাই- কার্বনেট। শরীরের পক্ষে এই ক্ষার খুব কড়া আর ক্ষতিকারক। এটা দেহকোষকে সরাসরি আঘাত করে। যদিও অম্লত্বের জন্য সাময়িকভাবে স্বস্তি পাওয়া যায়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দেহকোষ আক্রান্ত হয়ে চলে। চিকিৎসকেরা

অম্লত্বের যে ঔষধ দেন তাতে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড, অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট ইত্যাদি মেশানো থাকে। এরা খাবার সোডার সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের চাইতে অনেক মৃদু ক্ষার। তাছাড়া ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট শরীরে ঢুকে প্রথমেই কোষ্ঠের কোষেও পাতলা একটা আস্তরণ ফেলে দেয়। এতে দেহকোষ দীর্ঘ সময় সুরক্ষিত থাকে। এরই সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড অতিরিক্ত অম্লের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়। তাই বাড়িতে নিজের ইচ্ছামত খাবার সোডা খেয়ে নেওয়া কখনোই নিরাপদ নয় ।

৩) *গাছ লাগালে কি বৃষ্টিপাত বেশি হয়?*

আজকাল শোনা যায় গাছ লাগালে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। বেশি গাছ লাগালেই কি বৃষ্টি হবে? তাহলে বৃষ্টি কেন হয়, সেটা ভালোভাবে জানতে হবে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলেন সূর্যের তাপ নদী, পুকুর, সমুদ্র প্রভৃতির জল বাষ্প হয়ে যায়। জলীয় বাষ্প বাতাসের চেয়ে হালকা। তাই উপরে উঠে যায়। যত উপরে ওঠে বায়ুর চাপ কমতে থাকায় তার প্রসারণ হয়। তাতে আবার তাপমাত্রা কমে যায়। ফলে ঠান্ডা হয়ে যায়। তখন বাষ্প ছোটো ছোটো জলকণায় পরিণত হয়ে ভাসমান ধূলিকণায় ভাসতে থাকে। সমূহের উপরে আবার প্রচুর লবনকণা আছে। এই সব কণারা জলীয় বাষ্পে ঘনীভূত হয়ে জলকণা তৈরি করতে আরও সাহায্য করে। তাই বায়ুমন্ডল নিম্নলুক হলে জলকণা তৈরি হওয়া মুশকিল হত। জলকণাগুলি মিলেমিশে তৈরি করে মেঘ।

গাছ বেশি থাকলে সেখানে সোজাসুজি সূর্যের আলো মাটিতে পড়তে পারে না। তাই সেখানকার বাতাস ভেজা ভেজা থাকে। তাছাড়া গাছ মাটি থেকে যে জল শুষে নেয় তা আবার পাতার সাহায্যে দিনের বেলায় বাতাসে কিছুটা ফিরিয়ে দেয়। গাছপালা বেশি থাকলে অনেকটা বাষ্প একসাথে উপরে ওঠে আর বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। এই জলীয় বাষ্প বাতাসে ভাসমান কণগুলির সঙ্গে মিলে মেঘ তৈরি করে। মেঘ মানে বিভিন্ন মাত্রার জলকণার সমাবেশ। জলকণা আয়তনে এক মিলি বা তা বেশি হলেই বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে। ব্যাপারটা আসলে একটু জটিল। যাই হোক, বোঝা যাচ্ছে গাছ বেশি থাকলে কোনো জায়গায় স্থানীয়ভাবে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। তবে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে কখনোই নয়। মৌসুমী বায়ু প্রবাহের ফলে ব্যাপক বৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে গাছের ভূমিকা তেমন কিছু নয়। আর স্থানীয়ভাবে বেশি বৃষ্টির জন্য দু-চারখানা গাছ এদিক ওদিক লাগালে হবে না। ঘন বনসৃজনের মাধ্যমে কৃত্রিম অরণ্য তৈরি করতে হবে। তবেই এ নিয়ম খাটবে।

৪) *দেশি মুরগীর ডিম আর পোলট্রির ডিমের গুণাগুণ কি একই? হাঁস ও মুরগীর ডিমে গুণগত পার্থক্য আছে কি?*

দেশি মুরগীর ডিম আর পোলট্রির ডিমের কুসুমের রং আলাদা হওয়ার জন্যই এই প্রশ্নের উদ্ভব হয়। দেশি মুরগী বাগানে চরে খায়। তাই এদের কুসুমে ক্যারোটিন নামে একটি ভিটামিন তৈরি হয়। খাওয়ার পরে এই ক্যারোটিন ভিটামিন-এ তে পরিণত হয়। পোলট্রির মুরগী তৈরি খাবার খায়। তাই ডিমে ক্যারোটিন না থেকে প্রচুর ভিটামিন 'এ' থাকে। সেজন্য কুসুমের রং ফিকে হয়। একই মাপের দেশি আর পোলট্রির ডিমের খাদ্যগুণ একই হওয়ার কথা। বাস্তবে সুষম খাবার পায় বলে পোলট্রির মুরগীর ডিমের খাদ্যগুণ সামান্য বেশিও হতে পারে। হাঁসের ডিম ও মুরগীর ডিম নিয়ে জোরালো মতভেদ দেখা যায়। দুরকম ডিমই সমান উপকারী ও প্রায় সমান খাদ্যগুণ বহন করে। তবে যেহেতু হাঁসের ডিমের ওজন বেশি, তাই এতে মোট খাদ্যগুণের পরিমাণ বেশি।

শুক্তিতে হোক মুক্তো আর জলের আবিলতা মুক্তি

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

জলজ জৈব সম্পদে আমরা বরাবরই খুব সমৃদ্ধ সেই সঙ্গে বৈচিত্রও ঈর্ষণীয়। যদি আমাদের সাধারণ মিষ্টি জলের পুকুরগুলোর কথাই ধরি - সেখানে বিভিন্ন ধরনের মাছ ছাড়াও পাওয়া যায় অনেক অমেরুদন্ডী প্রাণী । এই অমেরুদন্ডীদের মধ্যে মোলাস্ক পর্বের দ্বি-ভালভ শ্রেণীর উভ লিঙ্গ প্রাণী হল ঝিনুক- যাকে শুদ্ধ বাংলায় শুক্তি নামে অভিহিত করা হয়।সাধারণত তিনটি প্রজাতির ঝিনুক আমরা দেখতে পাই- *ল্যামেলিডেন্স মারজিনালিস, ল্যামেলিডেন্স করিয়ানাস, পারেসিয়া করুগাটা* যাদের মধ্যে আবার *ল্যামেলিডেন্স মারজিনালিস* আমাদের রাজ্যের সব পুকুরে পাওয়া যায় প্রাকৃতিকভাবে। আগে এদের বিশেষ কার্যকরী উপযোগিতার কথা তেমনভাবে প্রচারে না আসার দরুন কিছু মানুষজন ঝিনুকের খোল পুড়িয়ে চুন বানাতেন এবং প্রকৃতই সেই চুন এতটাই ভালো যে পানের সঙ্গে তা না হলেই চলতো না। বিভিন্নভাবে আরো কিছু প্রয়োগ যেমন শার্টের বোতাম প্রস্তুতিতে, কিছুটা কারুশিল্পের অনুদান হিসেবে ব্যবহারের চল ছিল মাত্র। ঝিনুকের মাংস হাঁস বা মুরগির খাবার হিসেবেও ব্যবহৃত হত। ক্রমে জানা গেল এই ঝিনুকের জল শোধন করবার অপরিসীম ক্ষমতার কথা। একটা ঝিনুক যা আপাত দৃষ্টিতে স্থিতু এক চলচ্ছক্তিহীন বস্তু মনে হলেও মন্থর গতিতে সে সারা পুকুর বিচরণ করে জলকে পরিশোধন করে। একটি ঝিনুক সারা দিনে ৫৫ গ্যালন জল পরিশুদ্ধ করে জলকে নির্মল রাখার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে জলজ বাস্তুতন্ত্রের সহায়কের ভূমিকা পালন করে। জল পরিশোধনের ক্রিয়াটি শুরু হয় গিল বা ল্যামেলির সাহায্যে, পুকুরের জল শুষে নিয়ে সেখান থেকে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র শৈবাল অণুজীব ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে নির্মল জলকে আবার শরীরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে ক্রমাগত জলজ বাস্তুতন্ত্রের সহায়তার ভূমিকা পালন করে।

যে পুকুরে মাছ চাষ হয় বা মাছ আছে স্বাভাবিকভাবে সেখানে এই ঝিনুক চাষ সহজেই করা যেতে পারে। সাধারণত মাছ না থাকলে এদের চাষ করা একটু অসুবিধা জনক হয়ে পড়ে। ঝিনুক চাষ কে মাছ চাষের সঙ্গে সুসংহত চাষ হিসেবে গণ্য করা হয় । মিষ্টি জলে ঝিনুকের জীবন চক্রের লার্ভার একটি দশা যার নাম গ্লাসিডিয়াম লার্ভা, এরা মাছকে পোষক হিসাবে ব্যবহার করে। এই লার্ভা মাছের পাখনা আঁশ ও এমন কি ফুলকার সঙ্গে জড়িয়ে থেকে পুষ্টি রস টেনে নেয় ও বেড়ে ওঠে। এরপর লার্ভার হল দুটি কিঞ্চিৎ শক্তপোক্ত হয়ে উঠলেই মাছের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমেই পূর্ণ ঝিনুকের আকার ধারণ করে। এদের চাষ করতে তাই আলাদা করে কোন খাবার প্রয়োগের দরকার পড়ে না ।

ক্রমে যখন ঝিনুকগুলি বেড়ে ওঠে ও ফুলকার সাহায্যে দ্রবীভূত অক্সিজেন ও ভাসমান উদ্ভিদ কণা অনু শৈবাল টেনে নিয়ে স্বচ্ছ জল দিয়ে দেয় পুকুরে । এই ঝিনুকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তার মধ্যে মুক্তোর সৃষ্টি এবং এই কারণেই ঝিনুকের চাষ বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছে দেশব্যাপী। মিষ্টি জলের পুকুরে এই ঝিনুকের চাষ এখন মুক্তো চাষ বা pearl culture নামে সুপরিচিত - যদিও চাষ হচ্ছে ঝিনুকের এবং তার মধ্যে মুক্তো সৃষ্টি করানো হচ্ছে । এই চাষের বিশেষ ধাপ গুলির মধ্যে স্বাস্থ্যবান ঝিনুক বেছে সংগ্রহ করে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে তার ভিতর নিউক্লিয়াস বা গ্রাফ টিস্যু প্রতিস্থাপন করা হয়। এই প্রতিস্থাপনের আগে একটি ট্রে র মধ্যে জল রেখে সেখানে অন্তত এক ঘন্টা রাখতে হবে এবং ঝিনুকের খোলা বা সেল উন্মুক্ত করে তাদের মধ্যে গ্র্যাফ্ট টিস্যু প্রবেশ করাতে হয়।

যেসব ঝিনুক থেকে ম্যান্টেনার টুকরো সংগ্রহ করা হবে এবং eosin (দুই থেকে তিন ফোঁটা) দিয়ে ভিজিয়ে আধ ঘন্টার মধ্যে গ্রহিতা ঝিনুকের খোলা উন্মুক্ত করে valve opener এর সাহায্যে বাঁকানো নিডিলের সাহায্যে ঝিনুক ধারক কে আটকে রেখে একটি ছোট ফুটো এমন ভাবে করতে হবে যেন ঝিনুকের মধ্যে ঢোকানো নিউক্লিয়াস বিডটি না বেরোতে পারে। নিউক্লিয়াস বাহকের সাহায্যে ভেজানো বিডটিকে ঝিনুকের ভিতরে প্রবেশ করানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে এক টুকরো গ্রাফ টিস্যু বিডের উপর এমন ভাবে রাখা হয় যেন তা লেপটে থাকে।

এরপর বাঁকানো নিড়লের সাহায্যে ফুটোটি বন্ধ করে দিলে ঝিনুকটি আগে অবস্থায় ফিরে আসে। এই সময়ে এক ফোঁটা স্যানিটাইজার দেওয়া হয় যাতে সংক্রমণ সম্ভাবনা না থাকে। এরপর ঝিনুকটিকে পরিষ্কার জলের পাত্রে একদিন রাখা হয়। ও পরের দিন আবার তা ধুয়ে নিয়ে খাঁচায় করে রেখে দেওয়া হয় পুকুরের জলে। একমাস পরে খাঁচা থেকে তুলে পরখ করে নেওয়া হয় ঝিনুকের মধ্যে পলিস্যাক তৈরি হয়েছে কিনা। যদি না হয় সেই ঝিনুককে আবার গ্রাফ টিস্যু ঢুকানো হয়। গ্রাফ্ট টিস্যু তৈরি হয়ে গেলে সে গ্রহিতা ঝিনুকে প্রতিস্থাপন করা হবে সঙ্গে সঙ্গে গ্রহিতা ঝিনুকের ভিতরে সঙ্গে ও চেরা জায়গাটিতে eosin ডুবানো নিউক্লিয়াস গ্রাফট টুকরো স্থাপন করা হবে। ক্ষতস্থানে আবার স্যানিটাইজার দেয়ারও প্রয়োজন হতে পারে। এরপর পুকুরে এদের পরিচর্যা করতে বিশেষ যত্ন লাগে। পুকুর সর্বোতভাবে দূষণমুক্ত রাখতে হবে। অস্ত্রোপচারের পর খাঁচার মধ্যে রেখে জলে এমন ভাবে ঝোলানো অবস্থায় রাখা হয় যাতে যথেষ্ট সূর্যকিরণ প্রবেশ করতে পারে। অনু শৈবালের পরিমাণ জলের গভীরতা সৃষ্ট মুক্তোর উজ্জ্বল্য তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পুকুরের জলের গভীরতা ৬ থেকে ৭ ফুট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং জলের ph(7.5); দ্রবীভূত অক্সিজেন (6-8 ppm); ক্ষারকীয়তা(100-150 ppm) এমোনিয়া(0.02-0.04 ppm)। মাটির গুনাগুনের মধ্যে জৈব কার্বন সমন্বিত মাটিকে কিছুটা কাঁদা ও পাক এবং অনেকটা বালি যুক্ত হতে হবে। ও মাটির প্রতি ১০০ গ্রামে 50 মিলিগ্রাম n3 থাকতে হবে। চাষের মেয়াদ ও মুক্ত উৎপাদনের সময় লাগে প্রায় দেড় বছর মাঝে মাঝে পুকুরের তলদেশ রেকিং করে চুন প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে।

অস্ত্রোপচারের জন্য ঝিনুক ধারক, ভালভ্ ওপেনার, ছুরি, ফরসেপ , বাঁকানো নিডল, কাঁচি, কিছু ওষুধ যেমন ইউসিন, মারকিউরোক্রম, স্যানিটাইজার ইত্যাদির প্রয়োজন পড়ে।

ঝিনুক থেকে মুক্তো নিকাশ করতে সেগুলিকে গরম জলে কিছুটা সময় রেখে মুক্তো বার করা হয়। ভুবনেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত সিফা নামক আইসিএআর এর এক গবেষণা সংস্থা কৃত্রিমভাবে বাণিজ্যিক আকারে মুক্ত উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। সম্প্রতি কলকাতায় অবস্থিত ICAR CIFA তে মুক্তো উৎপাদনের পদ্ধতি আরও সরলীকরণ করা হয়েছে এবং এই চাষকে বাণিজ্যিক উদ্যোগে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। হুগলি জেলার বলাগড় ও ডুমুরদহে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও মহিলা সংগঠন ব্যাপকভাবে এই চাষে উদ্যোগী হয়েছে। আশার কথা এখন অনেক জায়গাতেই গ্রামীণ যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তো উৎপাদন করে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানে ব্রতী হয়েছেন। সামুদ্রিক মুক্তো চাষ (Marine Pearl System)এর চাষ প্রশিক্ষণ দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে । কিন্তু মিষ্টি জলের ঝিনুক চাষ একটি নতুন উদ্যোগ বলা যেতে পারে যা রোজগারের এক পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে। আমাদের রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় আরো প্রশিক্ষণ দরকার এবং তাহলে আমাদের রাজ্যের পুকুরগুলি যেগুলি এখনো অনাবাদি হয়ে পড়ে থাকে সেখান থেকে আয়ের উৎস খুঁজে পাবেন ইচ্ছুক তরুণ তরুণীরা।

চাষ করা মুক্তো-র কিছু নমুনা

Pearl producing *Lamellidens* also helps in cleaning water through filter feeding mechanism

ভারতীয় পাখী, যেমন দেখেছি

সমীর কুমার বারারি

আমাদের দেশে ১৩৫৮ প্রজাতির নানা পাখি পাওয়া যায়। সারা দেশ জুড়ে, সমস্ত রকম ভৌগলিক পরিবেশে এই সব পাখিরা ছড়িয়ে আছে। সব প্রজাতির পাখি বর্তমানে বন্যপ্রাণী সংরক্ষন আইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্য ২০৫ টি প্রজাতি শিডিউলে ১ এর অন্তর্ভুক্ত, বাকি ১১৩৬টি প্রজাতি শিডিউল ২ এ আছে। । নানা রকমের রঙিন পালকে মোড়া পাখি দেখতে কার না ভালো লাগে! আর উড়ে বেড়াবার ইচ্ছে থেকেই তো বিমানের আবিষ্কার। সাধারণত আমাদের চারপাশে যে সব পাখি প্রায়শই দেখা যায় তেমনই কিছু পাখি নিয়ে এই ফটো ফিচার। ফটো আমার নিজস্ব নিকন ৫২০০ ক্যামেরায় ৫৫-৩০০ লেন্সে তোলা, বেশিরভাগই আমার কর্মস্থল বিহারের রাজধানী পাটনা ও নিকটবর্তী এলাকায় তোলা ।

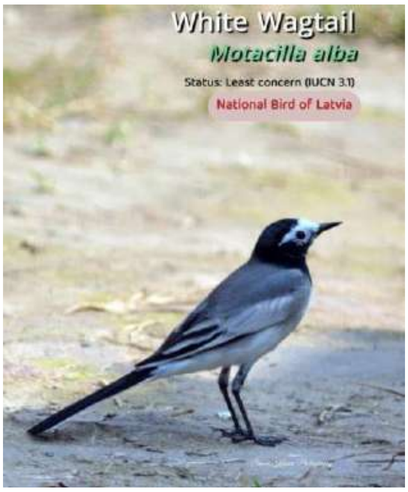

সাদা খঞ্জন (*Motacilla maderaspatensis*)

সাদা খঞ্জন পাখি সাধারণত আর্দ্র ও শুষ্ক এমনকি মরুভূমি অঞ্চলে বাস করে। আবাসস্থল হলো সমুদ্র উপকূল, পাথুরে বা উঁচু বালিময় নদী তীর অথবা অপেক্ষাকৃত নীচু অঞ্চলের নদীর পাড়, হ্রদের তীর, কৃষিজমি, বাগান ও ছোট তৃণভূমি। এছাড়া শহরের আশেপাশেও খঞ্জন দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণত এদের সমস্ত পালকে কালো, সাদা এবং ধূসর রঙের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তবে বিভিন্ন দেশে পালকের রঙে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণত একক, জোড়ায় জোড়ায় অথবা ছোট ছোট দলে হাঁটতে থাকে বা লেজটি উপর আর নীচ করতে করতে দৌড়াতে দেখা যায়। উড়ন্ত অবস্থায় জোরালো এবং এক ধরণের 'তিজ তিজ' ডাক দিয়ে চেনা যায়।

সাদা খঞ্জনের খাদ্য আবাসস্থলের ওপর নির্ভর করে। সাধারণত স্থলজ এবং জলজ পোকামাকড় এবং অন্যান্য ছোট অমেরুদণ্ডী প্রাণী এদের খাদ্যের প্রধান অংশ। বিটল, ড্রাগনফ্লাই, ছোট শামুক, মাকড়সা, কৃমি, মৃতদেহে পাওয়া ম্যাগট এমনকি মাছিও এদের খাদ্য। জলাশয়ের ধারে থাকলে ছোট মাছের পোনাও খেয়ে থাকে।

সাদা খঞ্জন একটি পরিযায়ী প্রজাতির পাখি। শীতের শুরুতে উত্তর ইউরোপ বা আমেরিকার বাস করা পাখিরা অপেক্ষাকৃত উষ্ণ পরিবেশে যেমন আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্যের দেশ, আমাদের দেশ ও অন্য দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলোতে চলে আসে। ওড়বার সময় খঞ্জন প্রায় ১৬,৫০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় উড়তে পারে। সাদা খঞ্জন পাখির সংখ্যা স্থিতিশীল হওয়ায়, বর্তমানে এদের সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই।

আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ ইউনিয়ন (IUCN) অনুযায়ী এর অবস্থান সবচেয়ে কম উদ্বেগজনক (আইইউসিএন ৩.১)

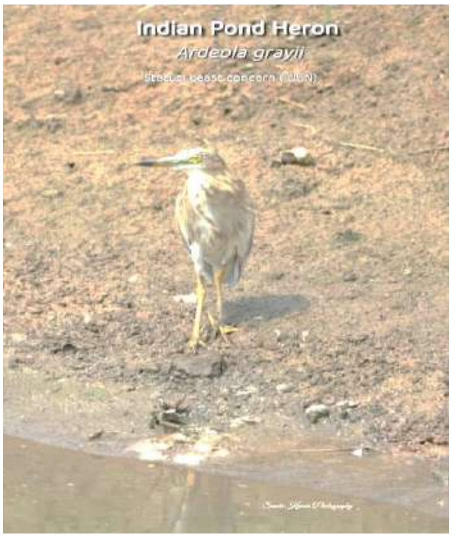

দেশী কানিবক (হেরন) (*Ardeola grayii)*

দেশী কানিবক (হেরন) সারা ভারত জুড়েই পাওয়া যায়, এদের মূলতঃ এশীয় মহাদেশেই বেশি দেখা যায় । দেশী কানিবক বা ছোট হেরন সাধারণত জলজ আবাসস্থলেই দেখা যায়। যে কোনো ধরণের জলাভূমিতে হেরন বাস করতে পারে, যেমন বনজঙ্গলের নদী নালা, কৃত্রিম জলাশয়, উপকূলীয় জলজ স্থান ইত্যাদি। এটি একটি ইগ্রেট ধরণের পাখি। বিশ্রামের সময় পাখিগুলি মাটির মতো বাদামী রঙের হয়, কিন্তু ওড়ার সময়, ডানা, লেজ এবং নীচের অংশে সাদা রঙ দেখতে পাওয়া যায়। তবে, প্রজননের সময়, প্রাপ্তবয়স্কদের পিঠ গাঢ় লালচে বাদামী, মাথা, ঘাড় এবং বুকের কাছে হলুদাভ রঙের হয়। চীনের হেরন ও আমাদের দেশীয় হেরনের মধ্যে অনেক মিল আছে। এই পাখী পুকুর বা জলাশয়ের ধারে সাধারণত একা একা থাকতেই বেশী পছন্দ করে, কিন্তু খাবারের প্রাচুর্য্য টের পেলে একজায়গায় অনেক সংখ্যক হেরন প্রায়শই জড়ো হয়।

পুকুরের ধারে এরা দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু খাদ্যের সন্ধানে গভীর জলের দিকে যাওয়ার জন্য কচুরিপানার মতো ভাসমান উদ্ভিদ ব্যবহার করে। এদের মাঝে মাঝে জলে সাঁতার কাটতে দেখা যায় বা জলের ওপর লাফিয়ে ওঠা মাছ ধরতেও দেখা যায়। জলাভূমি থেকে দূরে থাকা হেরনরা ঝিঁঝিঁ পোকা, বিভিন্ন পোকা মাকড়, ড্রাগনফ্লাই, মৌমাছি ইত্যাদি খায়। এছাড়া উভচর প্রাণী বিশেষভাবে ব্যাঙাচিও এদের খাদ্য।বর্তমানে যথেষ্ট সংখ্যক পাখি থাকায় সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ ইউনিয়ন (IUCN) অনুযায়ী হেরনের অবস্থান সবচেয়ে কম উদ্বেগজনক (আইইউসিএন ৩.১)।

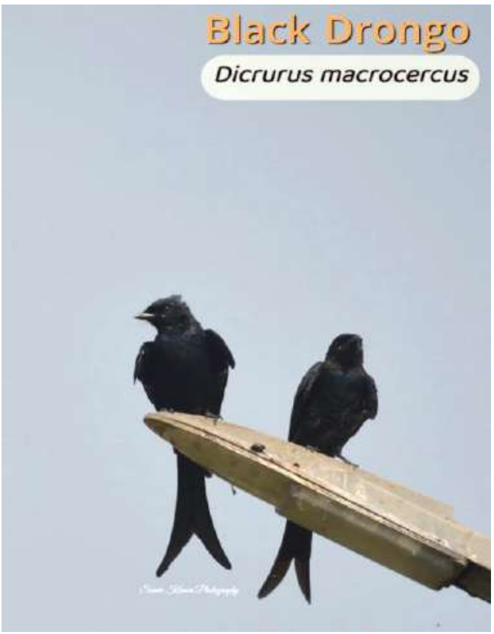

ফিঙে (*Dicrurus macrocercus*)

ফিঙে একটি ছোট, মসৃণ এবং চকচকে কালো রঙের পাখি। ফিঙের স্বতন্ত্র চেরা লেজের বৈশিষ্ট্য থাকায়, এই প্রজাতির পাখি খুব সহজেই চেনা যায় । শরীরের মোট দৈর্ঘ্যের অর্ধেকটাই লেজের দৈর্ঘ্য । প্রাপ্তবয়স্ক ফিঙের লেজের চেরা জায়গার শুরুতে একটা সাদা দাগ দেখা যায়, অন্যদিকে ছোটদের পেটের দিকে কিছুটা সাদা দাগসহ বাদামী রঙের আভা দেখা যায় ।

খামার, বনের ধার, তৃণভূমি, জলাভূমি এবং মাঠের মতো খোলা জায়গা এদের আবাসস্থল। এছাড়া এই পাখি তার, বেড়া বা গাছের ডালের উপর বসে থাকে যা আলোর বিপরীতে অনেক সময় সিলুয়েটের মতো একটি দৃশ্য তৈরি করে। ফিঙের কালো পালক আলোতে উজ্জ্বল নীল এবং সবুজ রঙের দেখায় করে, যদিও কিছু প্রজাতির এই গুণ তুলনায় অনেক কম। এই পাখি একটি হিংস্র প্রজাতি, প্রায়শই বারবার গোত্তা দিয়ে এবং কর্কশ আওয়াজ করে অন্যান্য পাখি, এমনকি নিজের চেয়ে বড় পাখিদেরও তাড়া করে। এরা অন্যান্য পাখি প্রজাতির ডাক দক্ষতার সাথে অনুকরণ করতে পারে আর নানারকম সুরেলা ভাবে ডাকতে পারে যেমন বিভিন্ন ধরণের মনোরম বাঁশি ডাক, নাকি সুর বা উচ্চ তীক্ষ্ন শিস ইত্যাদি। তবে ঝগড়ার সময় অবশ্য রেগে গিয়ে কর্কশ শব্দ করতে থাকে। এরা মূলত নানারকমের পোকামাকড় বিশেষত ফড়িং ও গুবরে পোকা ইত্যাদি খায়। জমিতে লাঙল চালাবার সময় এরা প্রায়শই মাঠের পোকামাকড় ধরতে চলে আসে, এছাড়া ঝোপঝাড়ে আগুন লাগলে সেখানকার পলায়নমান পোকামাকড় ধরে খায়।

ভারত ছাড়াও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশেষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এমনকি সুদূর চীনের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ফিঙে দেখা যায়। ফিঙে পরিযায়ী প্রকৃতির পাখি, সাধারণত শীতকালে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে চলে আসে। ওড়ার সময় ১৬,৮০০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত যেতে পারে। ফিঙে পাখির সংখ্যা স্থিতিশীল হওয়ায় ও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে পাওয়া বলে আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ ইউনিয়ন (IUCN) এর নিয়ম অনুযায়ী ফিঙের অবস্থান সবচেয়ে কম উদ্বেগজনক (আইইউসিএন ৩.১)।

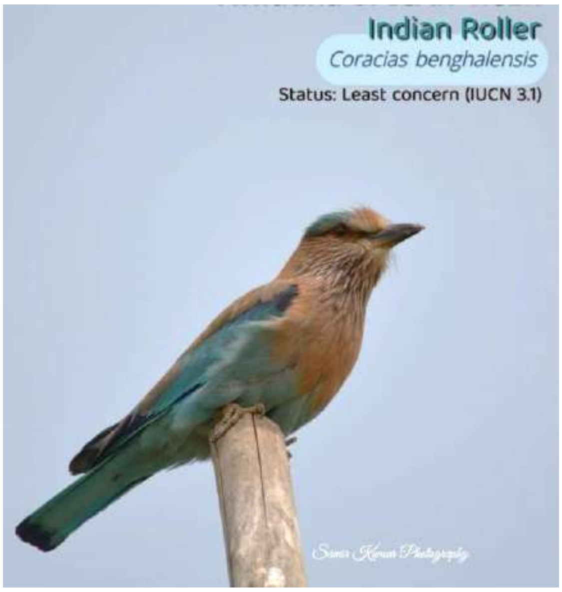

নীলকণ্ঠ (*Coracias benghalensis*)

নীলকণ্ঠ উজ্জ্বল রঙের পাখি, তাই সহজেই নজরে পড়ে। এদের ডানা, লেজ এবং পেটে বিভিন্ন ধরনের নীল রঙের পালক থাকে, যা উড়বার সময় আরো বেশি করে দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া এদের গলা এবং বুকে নীল রঙ ছাড়াও লম্বালম্বি সাদা রঙের পালক থাকে। সাধারণত নীরব প্রকৃতির পাখি, তবে প্রজনন ঋতুতে তীব্র আওয়াজ করে। এরা সাধারণত খোলামেলা জমি, বনাঞ্চল, কৃষি খেত ও গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। শহরের আশেপাশেও এদের দেখা যায়। বৈদ্যুতিক তার বা পাতা ঝরে যাওয়া গাছের ডালে বসার সময় মাঝে মাঝে ধীরে ধীরে লেজ নাড়াতে থাকে। মরা খেজুর, তাল, নারকেল ইত্যাদি গাছে এদের বাসা বানাতে দেখা যায় ।

সমগ্র ভারত জুড়ে এদের আবাস। এছাড়া এশিয়ার অনেক দেশ বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেও নীলকন্ঠ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এই পাখিকে প্রথমবারের মত আইনি সুরক্ষা দেওয়া হয় বন্য পাখি সুরক্ষা আইন (১৮৮৭) অনুযায়ী। এর শিকার নিষিদ্ধ করা হয় এই আইনে ও পরবর্তীতে বন্য পাখি ও প্রাণী সুরক্ষা আইনে ১৯১২ সালে।কর্ণাটক, ওড়িশা ও তেলেঙ্গানা নীলকণ্ঠ পাখিকে নিজ নিজ রাজ্যের রাষ্ট্রীয় পাখি ঘোষণা করেছে। বর্তমানে নীলকন্ঠ পাখির সংখ্যা যথেষ্ট হওয়ায় সংরক্ষণের প্রয়োজন নেই। আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ ইউনিয়ন (IUCN) অনুযায়ী নীলকন্ঠের অবস্থান সবচেয়ে কম উদ্বেগজনক (আইইউসিএন ৩.১)।

পরিশেষে নিজের একটি উপলব্ধির কথা বলতে চাই - জীবনে এমন কিছু সময় আসে যখন সময় নিজেই একটা সমস্যা হয়ে দাড়ায়। সেই সমস্যার নিরসনে ফোটোগ্রাফি বা ছবি তোলার অভ্যাস আমাকে আনন্দ দিয়েছে। নিজের কিংবা অন্য ফটোগ্রাফারের ছবি দেখতে দেখতে, কাটিয়ে দেওয়া যায় ঘন্টার পর ঘন্টা। নিজের তোলা ছবি যখন কারো প্রশংসা পায়, সেটা কতটা আনন্দের তা সেই ফটোগ্রাফারই উপলব্ধি করতে পারে। আমার নেশা বন্যপ্রাণীর ছবি তোলা, বিশেষ করে পাখির। তেমন কিছু পাখির ছবি ও তাদের তথ্য এই নিবন্ধে উল্লেখ করলাম ।

It Happened in a Day of
Ratha-Yatra in the Year 1956
and is Still on.....

If you come to Tripura
Don t forget to visit one of the
most nostalgic Restaurant of all times
The first Restaurant of Tripura

New Ashoka Restaurant

31,HGB Road, (Near Hawkers Corner)
Agartala, Tripura 799001

Mob: 9436120178 / 7005714919

To taste its exclusive quality of foods
including its special mughlai paratha.

As we are celebrating our
70th DURGA PUJA
this year. We convey our best regards
to all mughlai lovers throughout Tripura

স্মৃতিকথা

স্মৃতিটুকু

মধুমিতা দাস

দুধে নদীতে যখন বন্যা আসে, শীর্ণ নদী তখন ফুলেফেঁপে দুকূল ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।আমাদের ভলিয়া গ্রামও তখন জলে থৈ থৈ করে, আমাদের বাগানে আম, কাঁঠাল, বেল, জাম, পেয়ারা সব গাছের গোড়াগুলো তখন জলে ডুবে থাকে। বাগানটা আমাদের একার নয়, ওখানে আমার মেজ আর ছোটকাকারও অংশ আছে, বাঁশের কঞ্চির বেড়া দিয়ে যার যার অংশ আলাদা করা আছে। আমরা ভাইবোনেরা কিন্তু এসব মানি না, যে যখন পারে কারও অংশে ঢুকে পড়ে ফলটল পেড়ে নিয়ে আসে। বৈশাখ জৈষ্ঠ্য মাসে আম পাকার সময় আমি আর কাকার ছেলেরা তখন একসাথে বাইরের ঘরে ঘুমোই যাতে রাতে দু তিনবার উঠে আম কুড়িয়ে আনতে পারি। একদিন হয়েছে কি, আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেছে, মনে মনে ভাবছি আজ তো এতক্ষণ হয়ে গেছে ভাইগুলো আমায় আম কুড়োবার জন্যে তো ডাকেনি, বাথরুম পেয়েছিল, টর্চটা জ্বালিয়ে বাগানে গিয়ে দেখি কি ওরা আমাকে না ডেকে চুপিচুপি উঠে এক বস্তা আম কুড়িয়ে রেখে গেছে। খুব রাগ ধরল, ভাবলাম দাঁড়াও আমিও এখন তোমাদের ডাকব না, নিজে নিজে আম কুড়োবো।

একা একা আম কুড়িয়ে জড়ো করছি, আমাদের বাগানের গায়ে লেগে আর একজনের বাগান আছে, লোকটা যাকে বলে হাড়কিপটে, একটা পেয়ারা চাইলেও কাউকে দেয় না, এত পাজী! ওর বাগানের একটা বদনাম আছে, ওই বাগানে অনেকে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, আমি নিজেও একবার গলায় দড়িবাঁধা একজনকে গাছ থেকে ঝুলতে দেখেছি, টর্চের আলো ফেলে দেখি ওই বাগানে অনেকগুলো বড়ো বড়ো আম নীচে পড়ে আছে, আমি লম্বা বলে বেড়ার তলায় যে ফাঁক আছে তার তলা দিয়ে গলতে পারব না, তাই বাঁশের বেড়ার ওপর দিয়ে ডিঙ্গোতে গেলাম, যেই একটা পা ওপারে দিয়েছি, একটা সাপ পায়ের ওপর জড়িয়ে ধরল এক ঝটকায় চটি সমেত সাপটাকে ঝেড়ে ফেলে নদীর দিকে দৌড়লাম, কোনোদিকে না তাকিয়ে নদীর পাড়ের বালি তুলে পায়ে ঘষতে লাগলাম, ভয়ে বুক ধড়পড় করছে, পা কুটকুট করছিল, তারপর ভালো করে জলে পা ধুয়ে দেখলাম যে না সাপে কাটেনি তখন নিশ্চিন্ত হলাম। দুধে নদীর তীরে অপদেবতারা নাকি ঘুরে বেড়ায় তাই অন্ধকার নেমে এলে নিতান্ত দরকার না পড়লে কেউ আর নদীমুখো হয় না, সাপের পায়ে জড়ানো নিয়ে আমি এতোটাই মগ্ন ছিলাম যে রাতে এদিক পানে যে আসতে নেই তা মনে ছিল না, পা ছেড়ে সোজা হলে দেখি অদূরে যেখানে মড়া পোড়ানোর পর হাঁড়িকুড়ি পড়ে আছে সেখানে একজন স্ত্রীলোক মাটিতে মাথা রেখে বসে আছে, মাথার চুলগুলো চারধারে ছড়িয়ে আছে, আমার মনে হল আমাকে যেন কে ওইখানে পুঁতে রেখেছে, এক পাও আর এগোতে পারছি না, গলা দিয়ে কোনো স্বর ও বার হচ্ছে না, শিরদাঁড়া দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে, হে প্রভু জগন্নাথ রক্ষা করো !

ভাই দুটো ঘুম ভেঙ্গে আমায় না দেখতে পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে নদীর ধারে চলে এসেছে,

- কী রে! আমাদের ডাকিসনি কেন, এখানে কি করছিস, জানিস না রাত্তিরে এখানে একা আসতে নেই !

মুখ দিয়ে একটাও শব্দ বার করতে পারলাম না, খালি হাত উঁচু করে যেদিকে স্ত্রীলোকটি বসেছিল সেইদিকে ঈঙ্গিত করলাম,

- কী রে ওখানে কি, কিছু তো নেই, ভয় পেয়েছিস নাকি?

ওদের কথা শুনে আমিও ঘুরে দেখি আরে স্ত্রীলোকটি গেল কোথায়, হাঁড়িকুড়িগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে, ওর, কোনো চিহ্ন নেই, পূবের আকাশে তখন কমলা রঙ ধরেছে, ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হচ্ছে।

আমার একটা ছোট্ট বোন ছিল। হৃদয়ে একটা ফুটো নিয়ে জন্মেছিল, মাঝে মাঝেই নীল হয়ে যেত, তখন ওকে পিঠের ওপর চাপড় মেরে মেরে ঠিক করা হোতো, আমাদের সকলের কোলে কোলে ঘুরতো, সবাই খুব ভালবাসত, তখন অত চিকিৎসার সুবিধা ছিল না, আমাদেরও অনেক টাকা পয়সা ছিল না, তাও বড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, ডাক্তারবাবু বলেছিলেন ১৬ বছর হবার পর নিয়ে যেতে তখন ওর হৃদয় অপারেশন করে ফুটোটা বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে, অনেক টাকার ধাক্কা! মা, ঠাকুমারা যখনই কোনো ঠাকুর বাড়ী বা ঠাকুরের থানে যেত একটা করে মাদুলী নিয়ে এসে বোনের কবজিতে বা কোমরে বেঁধে দিত, ভগবানের আশীর্ব্বাদে যদি মেয়েটা ভালো হয়ে যায়! একটু বড় হলে ওকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হোলো, বাবা, কাকার কোলে চেপে স্কুলে যেত, প্রথম প্রথম টিফিনের আগেই ওকে নিয়ে আসা হোতো, তারপর ও নিজে নিজেই স্কুলে থেকে যেতে লাগল, বন্ধুদের সাথে বসে খাবার খেত, গল্প করত, খালি দৌড়োদৌড়ি করতে দেওয়া হোতো না, একদিন এইরকমই বসে বসে খেলা দেখছিল, হঠাৎ ধুপ করে পড়ে গেল, দিদিমণিরা ছুটে এসে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে মাথায় জলটল দিল, বোন আর উঠল না। অনেক ছোট ছিল, তাই দুধেই নদীর তীরে গর্ত করে বোনের দেহকে পুঁতে দেওয়া হোলো। তারপর কিছুদিন বাইরে থেকে ঘরে এলেই মনে হোত বোনটা এসে হাতদুটো তুলে কোলে নিতে বলবে, চোখে জল এসে পড়ত! আমি নদীর পাড়ে গিয়ে বসে থাকতাম। দিন গড়িয়ে অন্ধকার নামত, বোনকে দেখার আশায় আমি বুকে ভয় চেপে, একহাতে মাটি খামচে বসে থাকতাম, কিন্তু কখনও তাকে দেখতে পাইনি, মনের মধ্যে ধীরে ধীরে চেতনার অনুভব হচ্ছিল যে ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই, মরে গেলে মানুষ আর ফিরে আসে না, না হলে আমার বোনটা যাকে অত ভালোবাসতাম, সে একবারও কি আমাকে দেখা দিতে পারত না! আমার ভয় ভেঙ্গে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে, অন্ধকার হয়ে গেলেও তাই আমার আর নদীর পাড়ে যেতে ভয় করত না।বরং নির্জ্ন নদীর তীরে বসে থাকতে খুব ভালো লাগত।

বাগানে যখন আম, পেয়ারা, সবেদা পাড়া হত, বা কাঁঠাল ভাঙ্গা হত, তখন আমার বাবা, কাকারা তিনটে ভিন্ন ভিন্ন পাতা নিয়ে আসত, যেমন কেউ আনত কুল গাছের পাতা কেউ জামপাতা এইরকম আর কি! পাড়ার এক বাচ্চাকে ডেকে ওর হাতে ওই পাতা তিনটে দিয়ে দেওয়া হত, ও ওই পাতা তিনটে তিন জায়গায় রেখে ফল গুলো তিনভাগ করে এক একভাগের ওপর একটা করে পাতা রেখে দিত, যে যার পাতা অনুযায়ী নিজের নিজের ভাগ বুঝে নিত, এই নিয়ে কোনোদিন কোনো মন কষাকষি বা ঝগড়াঝাঁটি হয়নি।

এই গ্রামে যাদের প্রচুর জমিজায়গা ছিল তারা সবাই জমির চারপাশে নালাকেটে তাতে নদীর জল ঢুকিয়ে পরিখার মত করে রাখত, যাতে সহজে কেউ বাগানে ঢুকে ফলপাকুড় পেড়ে নিয়ে যেতে না পারে।

এইরকমই একজন ছিলেন উদয়পুরের জমিদার, উদয়পুর ছিল আমাদের পাশের গ্রাম, ওদের দশ বিঘের ওপর একটা বাগান ছিল, এত গাছ ছিল যে সূর্য্যের আলোও দিনের বেলা ঢুকতে লজ্জা পেত, ওই গা ছমছমে ঠান্ডা আবছায়া আঁধারে শোনা যায়, জমিদারের ছেলে এক পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখতে পায়, ছেলেটি সে কোথা থেকে এসেছে জিগ্যেস করলে, সে খালি বলে আমি তোমাদের বাড়ীতে যাব, ছেলেটি তাকে সঙ্গে করে বাড়ীতে নিয়ে আসে, জমিদারবাবু ও তাঁর স্ত্রী মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়ে যান, তাই বংশপরিচয় জানতে না পারলেও তাঁরা মেয়েটিকে কাছে রাখেন, নিজেদের মেয়ের মত করে লালন পালন করেন, তারপর বিয়ের বয়স হলে নিজেদের ছেলের সাথে একদিন ধূমধাম করে বিয়ে দেন। পরে ওদের একটি মেয়ে ও ছেলে হয়, মেয়েটির নাম রাখা হয় তুলসী।

রাতের বেলা একদিন চারজনে ঘুমিয়ে আছে, তুলসী ঘুম ভেঙ্গে বায়না শুরু করল, সে নাড়ু খাবে, নাড়ু আবার শিকেতে ঝোলানো আছে, তুলসীর বাবা ওর মাকে বলে নাড়ু পেড়ে দিতে, আর মা ওর বাবাকে বলে নাড়ু পাড়তে, নাড়ু আর কেউ পাড়ে না, তুলসীর কান্নাও আর থামে না। হঠাৎই তুলসীর কান্নাতে বিরক্ত হয়ে ওর মা যেখানে শুয়েছিল সেখান থেকেই হাত লম্বা করে শিকে থেকে নাড়ু পাড়তে লাগল, তাই না দেখে তুলসীর বাবা ভীষণ ভয় পেয়ে, চীৎকার করে ওই ঘরে খিল তুলে দিয়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল, রাতটা কাটল ভয়ে ভয়ে। পরের দিন পাড়ার লোকজন সবাই

ওই ঘরে গিয়ে দেখে যে ঘরে কেউ নেই, কেবল একটা অষ্টধাতুর দূর্গামূর্ত্তি পড়ে আছে, পরে স্বপ্নাদেশ হয় যে ওই মূর্ত্তিটাকে গ্রামেরই একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মনের বাড়ীতে রেখে আসতে, প্রতিবছর দূর্গাপূজোর সময় মহালয়ার দিন পাল্কী করে ওই মূর্ত্তি জমিদার বাড়ী নিয়ে আসা হয়, পূজো করা হয়, আর দশমী পর্যন্ত রেখে ওই মূর্ত্তি আবার ব্রাহ্মনের বাড়ীতে রেখে আসা হয়, এই প্রথা আজও চলে আসছে।

এই তুলসীর গর্ভে জন্ম হয় উড়িষ্যার বিখ্যাত কবি অভিমন্যু সামন্ত সিঙ্গার।

"পুণ্য মায়ের পুণ্য গর্ভে জন্মিল কবিবর। খ্যাতি তাঁর শীর্ষে উঠিল ভাষার কারিগর"।।

অঙ্কন

Pencil art by Krishna Paul

Spray Painting by Krishna Paul

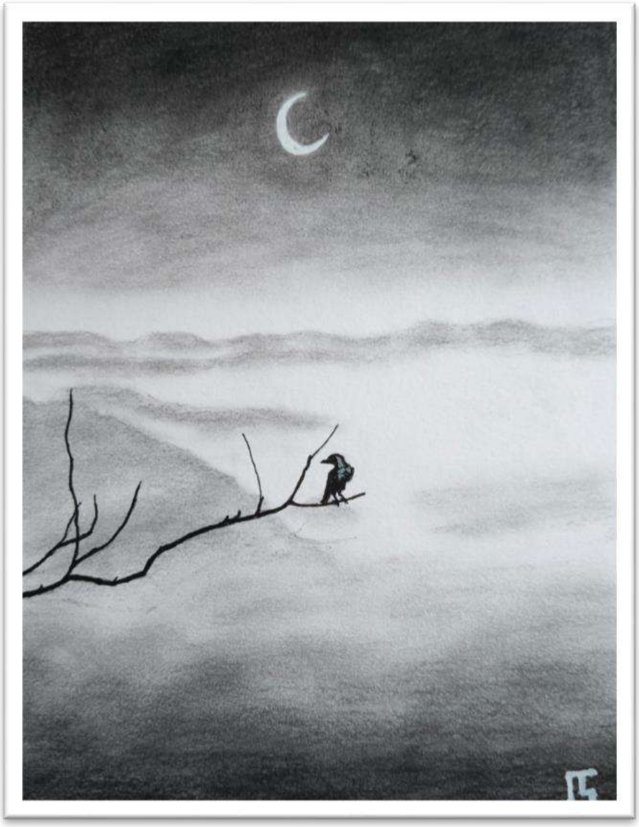

Charcoal painting by Debanjan Sur

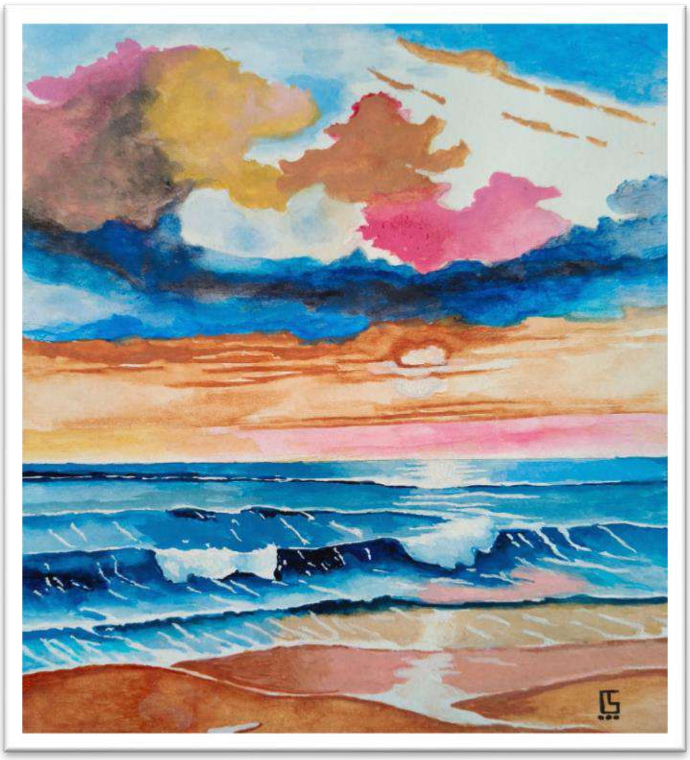

Oil painting by Debanjan Sur

With best compliments from

M/S Debi Plywood & Glass Solutions

Shantiniketan

Birbhum

With best compliments from

HABIBS®

Hair & Beauty

Ruby: P-51, Kasba Industrial Estate, Ph-1, Gate –III, Kolkata - 700 107, M: 8274056661, Rajat Debnath: 98305 42187, Uttam Debnath: 99328 49011, Prabir Das: 98313 55276; Jadavpur: 46A, Raja S.C Mallick Road Jadavpur, Sulekha More, Kolkata – 700032, M: 8910666252; Padmasree: 87B/1A Raja S. C. Mallick Road 1st Floor, Kolkata-700047 M: 7890922187; Mukundapur: 9/1 Mukundapur Rd, Kolkata-700099, Opposite to Mukundapur Police Station, M: 9038020458; New Town: AB-71, Street No.72, Action Area I, New Town, PIN: 700156, M: 91635 72131; UPOHAR Town Center: 2052, New Garia, Pancha Sayar, Kolkata – 700094, M: 098319 46932; Reg.Office: M-3 South Extension Part-II, New Delhi – 110 049; Ph. No.: 011-2953 6786, 2625 2727, e-mail: habibs.cosmetics@gmail.com; Website: www.habibshair.com

With best compliments from

Shyam Sundar Co.
Jewellers

Shyam Sundar Company Jewellers is all about 'a rich legacy and a continued pursuit of excellence'

Flagship Showroom: 131A, Rash Behari Avenue,

Kolkata – 700 029; Contact: 033-2464 2464, 99034 84388

Other showrooms: Behala: 033-2398 8822, 83369 79551;

Barasat: 033-2552 8822, 89109 90321;Agartala: 0381-238 1177, 84150 94170;

Dharmanagar: 03822 220020, 94367 79704;Udaipur: 03821-226821

Emerald Adventures: Exploring Ireland

K K Satapathy

Ireland, often called the 'Emerald Isle' due to its lush green landscapes, is third largest island in Europe. Geopolitically, it is divided into two main teritory, independent republic of Ireland (which covers about five sixths of island) and Northern Ireland which is the part of the United Kingdom and occupies the northeastern portion. It is separated from Great Britain to its east by North channel, the Irish sea and St Georges channel. Ireland is renowned for its cultural heritage including traditional music, dance, literature and art. It is home to numerous historical sites including ancient castles, monasteries and ruins. I embarked on a group tour through Ireland, starting from Glasgow (Scotland) in June 2024 through the stunning landscapes which promised the journey unforgettable.

Crossing the Irish Sea

The journey began with a comfortable coach drive from Glasgow to Cairon, picturesque port town in Scotland. The approximately two-hour drive took us through rolling hills and scenic country side. As I boarded the ferry, I was greeted by squawk of sea gulls and gentle rocking of the ship. The approximately two hours journey was a scenic prelude to the emerald landscapes awaiting us. I took a stroll on the deck, feeling the sea breeze and enjoying the scenery. As the ferry docked in Belfast, I felt a sense of excitement and curiosity about the city center. I was struck by the vibrant atmosphere and warmth of the people.

Inside the Ferry on Irish Sea

Belfast and the Titanic Museum

Arriving in Belfast, Northern Ireland's capital and principal port, we were greeted by a city that seamlessly blends history and modernity. Our guide led us to the Titanic Belfast Museum on the shipyard where the ill-fated Titanic ship was built. The Titanic set sail on its maiden voyage from Southampton on April 10,1912 with 2240 passengers on board. On the way it struck an iceberg on April 14. It broke apart and sank to the bottom of the ocean taking lives of more than 1500 people; the rest was saved. The remains of the ship was located in the ocean bed only in 1985. One of the most spoken debacle in modern history as it inspired numerous stories, several films and has been the subject of much scholarship and scientific speculation. The Belfast Museum, world's largest attraction dedicated to the Titanic, told the story of city's ship building legacy and the iconic ocean liner. Over 9^{th} floor levels, the museum tells the story of the Titanic's build, launch, maiden voyage and finally sinking on that fateful night. The museum has many interactive features, holographs and mementos. There were also sounds of

voices of the survivors and radio messages from the time of striking the iceberg to the sinking of the ship.

Belfast Titanic Museum

After the museum visit, on the way to our hotel, we had brief stop at the city hall, an imposing building built in the baroque architecture and centrally located.

Belfast City Hall

Exploring the Cliffs of Moher

Northern Ireland is considered a separate country ruled by British and uses pounds. We departed Belfast early morning crossing the border into the Republic of Ireland and headed towards the west coast. There is however no border

between the two countries and could not know when we crossed it. The drive was on the scenic coastal road with rolling green hills and stone walls dotting the landscape. After about five hours drive through Irish countryside, we arrived at the cliffs of Moher, one of the Ireland's most iconic natural wonders. The cliffs of Moher are sea cliffs located in the south western edge of the barren region of county Clare. Stretching about fourteen kilometers along the Atlantic, the cliffs rise dramatically 700 feet at the highest point. The scene is as if the hills are abruptly cut touching the sea.

Cliffs of Moher

The cliffs of Moher is now UNESCOs global geopark. At the visiting center at the entrance, there was 4D cinema and interactive exhibits which deepened our appreciation for the area's geology and wild life including puffins and seals. There are several different trails to choose from to hike along different parts of the cliffs. These paths were rocky and muddy. Our guide shared tales of folklore, pointing out O'Brien's tower, a 19th century look out perched on cliffs. Standing atop these majestic cliffs, gazing at the vast expanse of Atlantic Ocean, was an awe-inspiring experience. The magnificent cliffs host major colonies of nestling sea birds and are one of the countries most important bird breeding sites.

We spent ample time walking along designated cliffside pathways, taking the panoramic views and capturing countless photos of the iconic land mark.

Knit Wear Shops in Arian Island

After visiting the cliff, we drove to Galway, about one and half hour drive, a charming city, known for its vibrant art, traditional Irish music and delicious sea food. As I strolled through the city streets, I discovered unique streets, cafes, pubs each with its own charm.

The Aran Islands: A step back in time

Today's adventure takes us to the Aran islands from Rossaveal port, an hour drive from Galway through hilly road along the sea coast. The one-hour ferry ride across Galway Bay through crystal clear water was a delight with stunning views of the coastline and the wild Atlantic. As we arrived on the island, we felt like stepping back in time and struck by the rugged beauty of the land scape and warm welcome of islanders. We rented one bus to go to the central part of the island exploring the rugged landscape, driving past ancient stone walls, traditional cottages and breathtaking coastal scenery. There are also horse carts for the journey, available on payment for 50 Euro. The bus driver acted as guide who shared stories of the island's history from ancient Celts to modern day islanders who speak Irish (Gallic language).

On the way to Arian Island Cliffs

The highlight was undoubtedly reaching a magnificent prehistoric fort perched dramatically on the edge of a cliff offering unparalleled views and tangible connection to Ireland’s ancient past. The simplicity and authenticity of island life were refreshing, contrast to bustling cities. We also visited a cluster of local knitwear shops famous for Aran sweaters. The Aran Island includes some of the most beautiful cliff formations in Ireland. These cliffs sculpted by thousands of years of erosion are dramatic and breath taking. We had to purchase five Euro ticket for having a trek little uphill to reach the cliff beside the Atlantic Sea. After a memorable day on Aron Island, we returned to Galway for another night allowing us to further immersed in its charm.

Outside the Guiness Store House

Dublin: Ireland's Resurgent Capital

Our final leg of the journey, a three-hour drive brought us to Dublin, Ireland's vibrant capital. The transition from the rugged west to the bustling east was noticeable. The drive took us through scenic countryside, with rolling hills and picturesque villages. Arriving in Dublin, we were struck by vibrant energy and charm. A lady guide arrived giving us information regarding rich history and culture while passing through different places as a part of the city tour. The city was established 1200 years ago by Vikings. English ruled the island for 800 years who had nothing in common as regards culture, language etc. She informed that though only 5.4 million people lives in Ireland, there are about 60 million people in world with Irish background including 23 US presidents. We passed by national museum, parliament house, prime minister's office, national gallery, Georgian square *etc*. There was a monument for Rabindranath Tagore also.

Trinity College, Dublin

Durban is a UNESCO city of literature with four Nobel laureates from the city. George Bernard Shaw and Oscar wild, the English play wrights were friends of Rabindranath Tagore. Anne Besant came to India from here and devoted to Indian causes influencing Indian freedom movement. A visit to the Guiness store house was a highlight, offering a fascinating insight into the brewing process depicting the story of Ireland's most famous Guiness beer and also a panoramic

view of the city from the gravity bar. Founded in 1759, by Arthur Guiness, it is one of the most iconic beer breweries globally. Inside the building, the history of the storehouse as well as the process involved in beer making through 3D movie and interactive exhibition areas including the ingredients, brewing, transport and the like. In the gravity bar in the fourth floor and pint bar in the seventh floor, we were offered one glass of beer each, which were however quite bitter and could not take even after mixing some sweet liquid.

Long Room Library of Trinity College

A guided tour also took us to Trinity college surrounded by so much history and wonderfully preserved. It was established by Queen Elezabeth-1 more than 700 years ago. Oscar Wild, Jonathan Swift and many other luminaries were all students of the college. The main area of visit was the book of Kells belonging to the 9th century. It is an illuminated manuscript and celtic gospel book in Latin containing four gospels of the New Testament together with various prefatory texts and tables. There were large numbers of sculptures of famous luminaries, Aristiotle, Plato and the like, installed in the library. We had a photo stop at Phoenix park, Europes largest city park comprising 1750 acres green area containing several sculptures and monuments.

Phoenix Park, Dublin

As we reflected our journey, we felt grateful for the opportunity to experience Irelands diverse land scapes, rich history and vibrant culture. From stunning natural beauty of the cliffs of Moher to the charming streets of Dublin, the journey was truly unforgettable.

বাংলাদেশ ভ্রমণ

দিলীপ কুমার কুন্ডু

গত ফেব্রুয়ারি ২০২৪, দুই সপ্তাহের একটা গ্রুপ ট্যুরে কোলকাতার এক ট্রাভেল অপারেটরের মাধ্যমে আমরা মোট ১৮ জন বাংলাদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলাম। সেই ট্যুরের অভিজ্ঞতা নিয়েই এই ভ্রমণ কাহিনী।১৮ ই ফেব্রুয়ারি সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে কক্সবাজার হোটেল (Hotel Coastal Peace) থেকে 'চেক্ আউট' করে আমরা রওনা হলাম চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। ঘন্টাখানেক পথ চলার পর রাস্তার ধারে একটা পেট্রোল পাম্প পরিসরে আমরা 'শর্ট ব্রেক' নিলাম গাড়িতে পেট্রোল ভরা এবং চা খাওয়ার জন্য। সেদিন ভ্রমণের প্রথম আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নদী তলদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গ পথে চট্টগ্রাম পৌঁছানো।

কর্ণফুলী টানেল - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

আমাদের গাড়ি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর নীচে নির্মিত ৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল পেরোল দুপুর দেড়টা নাগাদ। জলপৃষ্ঠের নীচে এই টানেলটির গভীরতা ১৮ থেকে ৩১ মিটার। এপ্রোচ রোড সহ এই সুড়ঙ্গ পথটির মোট দৈর্ঘ্য ৯.৩৯ কিলোমিটার। ২০২৩ সালের ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সুড়ঙ্গ পথটির উদ্বোধন করেন।

এই সুড়ঙ্গপথটি চট্টগ্রাম শহরের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির পাশ দিয়ে শুরু হয়ে নদীর দক্ষিণ পাড়ের আনোয়ারা প্রান্তের চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড এবং কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড কারখানার মাঝামাঝি স্থান দিয়ে গিয়ে নদীর অপর প্রান্তে পৌঁছে নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে যুক্ত করেছে। এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ঢাকা- চট্টগ্রাম- কক্সবাজার মহাসড়ক যুক্ত হয়। এই সুড়ঙ্গটি বাংলাদেশের প্রথম সুড়ঙ্গ পথ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নদী তলদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম সড়ক সুড়ঙ্গপথ। কর্ণফুলী নদীর মাঝখানে সুড়ঙ্গটি ১৫০ ফুট গভীরে অবস্থিত। এই সুড়ঙ্গ পথে দুইটি লেন আছে। প্রতিদিন প্রায় সতের হাজার পণ্যবাহী ট্রাক, বাস, মোটরগাড়ি যাতায়াত করে।

এই টানেলটি এবং তার পাশেই আধুনিক বন্দর সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক নির্মাণ করেছে একটি চীনা প্রতিষ্ঠান (চায়না কমিউনিকেশন এন্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড)। কর্ণফুলী নদীর দুই তীর সংযুক্ত করে চীনের সাংহাই শহরের আদলে 'ওয়ান সিটি টু টাউন' গড়ে তোলার লক্ষ্যে টানেলটি নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল সাড়ে চার বছর এবং খরচ হয়েছিল প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকা।

দুপুর দুটো নাগাদ আমরা চট্টগ্রাম শহরের রেলস্টেশনের পাশে অবস্থিত 'হোটেল সৈকত' এ 'চেক্ ইন্' করে ওখানকার ক্যাফেটেরিয়াতে লাঞ্চ সেরে নিলাম। তারপর কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে বিকেল চারটেয় বেরিয়ে পড়লাম চট্টগ্রাম শহরের মধ্যেই অবস্থিত কয়েকটা ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় স্থান দর্শন করতে।

অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মাস্টারদা সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের কথা আমরা সবাই স্কুলের পাঠ্য বইতে পড়েছি। আমরা সেই জায়গাগুলো চাক্ষুষ দেখতে গেলাম যেখান থেকে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখা ১৯৩০ সালে ও পরবর্তী সময়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী লড়াই চালিয়েছিলেন।

ইউরোপিয়ান ক্লাব

আজ চট্টগ্রামের সেই ঐতিহাসিক "ইউরোপিয়ান ক্লাব" দর্শন করলাম যেখানে ১৯৩২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর রাতে বীর কন্যা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দর তার বিপ্লবী দল নিয়ে ইংরেজদের উপর বোমা ও

গুলি চালিয়ে আক্রমণ করে মাত্র একুশ বছর বয়সে শহীদ হয়েছিলেন । চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের ঘটনাটি পাথরের ফলকে লেখা আছে।

চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলী রেলস্টেশনের কাছে ইউরোপিয়ান ক্লাবটি ছিল ব্রিটিশদের বিনোদন কেন্দ্র। পাহাড় ঘেরা এই ক্লাবের চতুর্দিকে সিকিউরিটি গার্ডদের অবস্থান ছিল। ক্লাবের কর্মচারী, বয়-বেয়ারা, দারোয়ান ছাড়া এদেশীয়দের সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল। ক্লাবের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল 'Dogs and Indians Prohibited'। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা প্রথম ও দ্বিতীয় দফায় শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ব্যর্থ হয়। এবার সূর্য সেন এই মিশনের জন্য একজন মহিলা নেত্রী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।কিন্তু ঘটনার সাত দিন আগে কল্পনা দত্তকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে এই ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব দেন সূর্য সেন।

ইউরোপিয়ান ক্লাবের কর্মচারী যোগেশ মজুমদারের আশ্রয়ে ও সহযোগিতায় ১৯৩২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর রাত ১০ টা ৪৫ মিনিটে প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দর পাঞ্জাবী ছেলেদের ছদ্মবেশে পনের জনের বিপ্লবী দল নিয়ে চারদিক থেকে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। বিপ্লবীদের গুলি ও বোমার আঘাতে ইউরোপিয়ান ক্লাব কেঁপে উঠেছিল। মিসেস সুলিভান নামে একজন ব্রিটিশ নিহত ও এগারোজন আহত হন। ক্লাবে থাকা কয়েকজন ইংরেজ অফিসারের কাছে রিভলবার ছিল, তারা পাল্টা গুলি চালান। একজন মিলিটারি অফিসারের গুলিতে প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দর আহত হন। অভিযান শেষ করে বিপ্লবী দলের সাথে কিছুদূর এগিয়ে যান আহত দলনেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দর। ইংরেজদের হাতে গ্রেফতার হবার আশংকায় পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দর। পুলিশ পরদিন ২৪ শে সেপ্টেম্বর ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে মৃতদেহ দেখে প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দরকে সনাক্ত করে। তাঁর মৃতদেহ তল্লাশীর পর বিপ্লবী লিফলেট, অপারেশন প্লান, রিভলবারের গুলি, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি বিচারাধীন বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবি এবং একটা হুইসেল পাওয়া যায়। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি' চট্টগ্রাম শাখার একুশ বছর বয়সী বিপ্লবী সদস্যা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দরের এই মহান আত্মত্যাগ চিরস্মরনীয়। যেখানে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল, ঠিক সেই জায়গায় পরবর্তীকালে শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দর এর একটি আবক্ষ স্ট্যাচু বসানো হয়েছে।

ইউরোপিয়ান ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে অবস্থিত শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দর এর স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই দিনগুলো মানসচোখে দেখতে পাচ্ছিলাম। ঐতিহাসিক ঐ ক্লাব পরিসর এবং শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দরের স্ট্যাচুর কয়েকটা ছবি ক্যামেরা বন্দি করলাম।মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী দল চট্টগ্রামে যে অস্ত্রাগারটি লুঠ করেছিল সেই ঐতিহাসিক অস্ত্রাগার (Chittagong Armoury) দেখার অদম্য ইচ্ছে ছিল, আমাদের ট্যুর গাইড আকবর ভাইকে বললাম সেখানে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেই অস্ত্রাগারটি বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 'চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট' পরিসরের (prohibited area) মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের পাশের রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আকবর ভাই চলন্ত গাড়ির ভিতর থেকে ঐতিহাসিক অস্ত্রাগারের প্রাচীর দেখিয়েছিল, কিন্তু তার ছবি আমরা তুলতে পারিনি।

চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড় ও জঙ্গল যেখান থেকে মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ চালিয়ে ছিল, তার নিচ দিয়েই আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো আমাদের পরবর্তী দ্রষ্টব্য স্থান শ্রী শ্রী কৈবল্যধাম (শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ ঠাকুর সেবাশ্রম) এর দিকে।

শ্রী শ্রী কৈবল্যধাম - রামঠাকুর সেবাশ্রম

রাম ঠাকুর (রাম চন্দ্র চক্রবর্তী, ২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬০ - ১ মে, ১৯৪৯) ঊনবিংশ শতকের একজন হিন্দু ধর্মগুরু এবং সাধক। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজ জীবনে কুসংস্কার, ব্রিটিশ রাজশক্তির সৃষ্টি করা ভেদ নীতি ও দাঙ্গার বিরুদ্ধে শুধু আধ্যাত্মিক চেতনায় মানুষকে বলীয়ান করাই নয়, সমাজ সংস্কারের এক সার্থক রূপকার ছিলেন রাম ঠাকুর।

শ্রীশ্রী রামঠাকুরের নির্দেশে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে পাহাড়তলীতে ১৯৩০ সালে কৈবল্যধাম আশ্রম তৈরি হয়। এই আশ্রমটি হল এমন একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র যেখানে যে কোনো ধর্মবিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী মানুষ প্রশ্ন করতে, আলোচনা শুনতে, প্রার্থনা করতে, হরিনাম করতে বা শুনতে, ধ্যান, জ্ঞান এবং নিজেকে পরের সেবায় উৎসর্গ করতে আসেন।

কৈবল্যধামের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের দিগন্ত ছোঁয়া মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। তার পাশেই রয়েছে 'কৈবল্য শক্তি' নামের বটগাছটি এবং 'কৈবল্য কুন্ড' নামে বড় একটা পুকুর; ভক্তরা সেখানে পুণ্যস্নান করে থাকেন। পুকুরের উত্তর দিকে 'গয়াঘর' নামে একটা জায়গায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করা হয়। ঠাকুর বলেছিলেন যে, এখানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হলে ভারতের গয়ায় কাজ করলে যে সুফল লাভ হয় তেমনটাই হবে। পরবর্তীকালে আশ্রম প্রাঙ্গণে নির্মাণ করা হয় 'হর-গৌরী মন্দির' এবং অতিথি ও ভক্তদের থাকা ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মের জন্য নতুন একটি ভবন।

আমরা কৈবল্যধাম পরিসরে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে সেখানকার কয়েকটি ফটো ক্যামেরা বন্দি করে রওনা দিলাম আমাদের হোটেলের দিকে। সন্ধ্যার পরে আমরা গিয়েছিলাম নিকটবর্তী একটা মার্কেটে কিছু কেনাকাটা করতে। পরদিন সকালে আমরা রওনা হব ঢাকার উদ্দেশ্যে।

ইউরোপিয়ান ক্লাব, চট্টগ্রাম

কৈবল্য শক্তি' বটগাছ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল

Visit to York

Mrinmoy Datta and Reena Datta

York means Yorkshire located in the North of England, is known for its diverse landscape and sits on the East Coast rail mainline halfway between Edinburgh and London. In India, the name 'Yorkshire' is famously associated with pigs through the Yorkshire Pig, also known as the 'Yorkshire Large White'. This breed of pig is known for its 'Origin': Developed in Yorkshire, England, in the 19th century and this pig is highly valued for its lean meat, making it a popular choice for pork production.

Yorkshire, affectionately known as God's Own Country, is a treasure trove of natural beauty, rich history, and vibrant culture. Located in the north of England, this stunning county offers a unique blend of breathtaking landscapes, charming towns, and warm hospitality. York was twice the capital of England, once in Roman times as capital of Britain and later in the medieval period after King Edward I made York the military capital during his campaigns against Scotland.

Exploring Yorkshire's Diverse Landscapes

1. 'The Yorkshire Dales': A haven for outdoor enthusiasts, the Yorkshire Dales National Park boasts picturesque valleys, rolling hills, and scenic villages.
2. 'The North York Moors': This national park offers a mix of heather-covered moors, woodlands, and coastal scenery, perfect for hiking and exploration.
3. 'The Coast': Yorkshire's coastline is dotted with charming seaside towns like Whitby, Scarborough, and Bridlington, each with its own unique character.

Uncovering Yorkshire's Rich History and Culture

1. 'York': The historic city of York is a must-visit, with its Roman walls, medieval architecture, and iconic York Minster.
2. 'Castles and Estates': Yorkshire is home to numerous castles and stately homes, such as Castle Howard and Harewood House, showcasing the county's rich history and architectural heritage.
3. 'Industrial Heritage': The county's industrial past is evident in cities like Leeds and Sheffield, with their impressive architecture and cultural attractions.

Experiencing Yorkshire's Warm Hospitality

1. 'Local Cuisine': Yorkshire is famous for its delicious food, including Wensleydale cheese, Yorkshire pudding, and parkin.
2. 'Friendly Locals': Yorkshire folk are renowned for their warm welcomes and friendly nature.
3. 'Events and Festivals': Yorkshire hosts various festivals and events throughout the year, such as the Yorkshire Festival of Storytelling and the Great Yorkshire Show.

We arrived in York Station by train in a journey of 4 hours from Milton Keyens Central present in Buckinghamshire in north west of London .

York Railway Station

Ghost Walk

With its long and interesting history, it is no wonder that York is one of Europe's most haunted cities with over 500 hauntings and we took a Ghost Walk which was established in 1973 in the city.

Walking Tour in Ghost Hauntings

Walking in Ghost Area amidst charming churches

Yorkshire is home to numerous ghost stories and haunted locations, particularly in its charming churches and villages. Here are some of the most notable stories behind haunted places. Romans occupied Britain including Yorkshire from around 71 AD to 410 AD and violence and persecution did occur during the Roman occupation (341 years) . York, a city with a long history dating back to the Romans has numerous ghost stories and haunted locations.

'The Phantom Monk of Newby Church': This legendary ghost story revolves around a spectral figure captured in a photograph taken by Reverend Kenneth F. Lord in 1963 at the Church of Christ the Consoler in Newby Hall, North Yorkshire. The figure is believed to resemble a 16th-century monk with a white shroud over his face, possibly to mask leprosy or another disfigurement. Some speculate that the monk might be a guardian spirit or a restless soul seeking atonement.

'Atwick's Headless Horseman and White Lady': The village of Atwick is said to be haunted by a headless horseman, often seen waiting by the roadside, and a white lady who walks around a market cross near some standing stones.

'Brantingham Church's Headless Girl*: Brantingham Church is reportedly haunted by a headless ghostly girl who has been seen walking around the churchyard by motorists, cyclists, and dog walkers.

'Brough's Phantom Highwayman and Roman Soldiers': The town of Brough is said to be haunted by the phantom highwayman Dick Turpin, Roman soldiers, and ghostly monks who have been seen walking along the embankment near the Humber Estuary.
'Paull Holme Tower's Ghostly Bullock': According to local legend, a ghostly bullock climbed the steps to the top of Paull Holme Tower and fell to its death in 1840.

'Peggy Farrow's Spirit': Peggy Farrow, a woman accused of witchcraft, is said to haunt Green Lane in Elloughton, where she was allegedly hanged by villagers.

Coastal Area

Coastal area in Yorkshire is Scarborough located in North Sea and it is only 64 km away from York present in North Yorkshire .It is a popular seaside resort town on the northeast coast of England.

Seaside in Scarborough in Yorkshire

The Rotunda Museum in Yorkshire is a gem on the stunning Yorkshire coast, specifically located in Scarborough. This museum is one of the world's first purpose-built museums, opened in 1829, and is home to an outstanding collection of objects related to geology and the early history of the Scarborough area. The museum houses over 5,500 fossils and 3,000 minerals, including the Speeton Plesiosaur, a fantastic marine reptile from the Lower Cretaceous period. You'll also find artifacts from the Star Carr archaeological site, providing insights into the lives of prehistoric ancestors.

Rotunda Museum

Rocks & Minerals in Display

At this museum, one can explore the sensory Jurassic gallery, dress up in the Midieval York exhibit and get creative at the Dinosaur Country Gallery's colouring table.

At Museum in Yorkshire Coast

National Railway Museum

The National Railway Museum in York is one of the world's greatest railway museums, showcasing a vast collection of historic locomotives and railway artifacts. Located in the heart of York, the museum is a must-visit for railway enthusiasts and anyone interested in the history of transportation. The National Railway Museum is a fantastic destination for anyone interested in railways, history or technology. With its vast collection of locomotives and interactive displays, it's a great place to learn and have fun. It was established in York in 1975.

Collections and Exhibits
1. 'Iconic Locomotives': The museum boasts an impressive collection of iconic locomotives, including the Flying Scotsman, Mallard, and the record-breaking steam locomotive that holds the world speed record for steam locomotives.
2. 'Railway Artifacts': The museum showcases a wide range of railway artifacts, including historic carriages, wagons, and signaling equipment.
3. 'Interactive Displays': Visitors can enjoy interactive displays, including simulated train journeys and hands-on activities.

Highlights
1. 'The Great Hall': The museum's Great Hall features a stunning collection of locomotives, including some of the most famous trains in history.
2. 'The Mallard Story': The museum tells the story of Mallard, the record-breaking steam locomotive that still holds the world speed record for steam locomotives.
3. 'The Flying Scotsman': The museum has a special exhibit on the Flying Scotsman, one of the most iconic locomotives in the world.

Entry to Museum

Great Hall of Museum

Views of Railways

Railways in Display

City Cruise

City Cruise in York is operating in the river 'Ouse' flowing inside the city and city cruise for an hour took us in the countryside of York.

City Cruise in River 'Ouse'

Going through the different places in the City

Clifford's Tower

Clifford's Tower is a 13th-century tower located in York, North Yorkshire, England. It's a significant historical landmark and a popular tourist attraction. Clifford's Tower is a fascinating piece of history that offers insights into the medieval past of York. Visitors can explore the tower and enjoy the stunning views of the city.

History
1. 'Construction': The tower was built in the 13th century as a royal castle and fortress.
2. 'Name Origin': The tower's name is believed to come from Robert Clifford, the 1st Baron de Clifford, who was involved in a siege of the castle in the 14th century.
3. 'Historical Events': The tower has played a significant role in various historical events, including the Second Barons' War and the English Civil War.
Architecture and Features

1. ‘Design’: The tower is a keep, a type of fortified tower that served as a stronghold and residence.
2. ‘Architecture Style’: The tower's architecture is characteristic of medieval fortifications, with thick walls and a distinctive shape.
3. ‘Views’: The tower offers stunning views of the city of York and the surrounding countryside.

Clifford’s tower

York Army and Castle Museum

The York Army Museum is a must-visit attraction in York, showcasing the history of two current serving regiments of the British Army: The Royal Dragoon Guards and The Royal Yorkshire Regiment. Located at 3 Tower Street, York, YO1 9SB, the museum offers a unique experience, with exhibits tracing the proud history of the regiments over 300 years. The York Army Museum is a hidden gem, worth visiting for its thought-provoking and moving exhibits.

York Castle Museum is a popular attraction in York, North Yorkshire, showcasing the city's rich history and cultural heritage. Located on the site of the former York Castle, the museum features various exhibits, including *Kirkgate*: A recreated Victorian street with shops and businesses from the late 19th century, offering a glimpse into life during that era - *York Castle Prison*: Explore the history of the prison and its infamous inmates, including Dick Turpin - *1914: When the World Changed Forever*: An exhibit on World War I, featuring artifacts and stories of Yorkshire people who lived and died during the war - *The Sixties*: A gallery showcasing the music, fashion, and culture of the 1960s, with items like a Lambretta scooter and Beatles singles - *The Period Rooms*: A series of rooms furnished and decorated in different styles, reflecting the lives of York's inhabitants throughout history – ‘Toy Stories’: A nostalgic exhibit featuring toys and childhood pastimes – ‘Secrets of Dress’: A refreshed exhibition revealing the secrets of dress and fashion

York Army Museum

York Castle Museum

Vibrant City

York is a vibrant city, known for its rich history, cultural attractions and friendly atmosphere. It is famous for its traditional pubs, tea room and restaurants serving everything from local specialities to international cuisines.

City of York

Conclusion

A visit to Yorkshire is a journey through a county that seamlessly blends natural beauty, rich history, and vibrant culture. Whether one is interested in exploring the outdoors, uncovering the past, or experiencing the local way of life, Yorkshire has something for everyone.

আমার দেখা কাম্বোডিয়া

বিনয় কুমার সাহা

এরিকেয়ারের ২০২৫ বিদেশ সফর হিসেবে ভিয়েতনাম ও কাম্বোডিয়া ঠিক হল। তাই তড়িঘড়ি সদস্যদের নোটিশ দিয়ে জানান হোল এবং এবছর আমরা বন ভয়েজ ট্রাভেল ক্লাবকে বেছে নিলাম। সবকিছু আলোচনার পর এবং টিকিট, ভিসার সময়সীমা পাবার পর সফরের তারিখ ঠিক হল ০৫.০২.২০২৫ থেকে ১৫.০২.২০২৫. এবারের মোট সদস্য ছিল তেইশ জন এবং বন ভয়েজের মি: সান্তনু বাবু, আমদের ট্যুর অপারেটর।সময় ত আর বসে থাকে না। যথারীতি ০৪.০২.২০২৫ রাত আটটায় বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এয়ারপোর্টে পৌছলাম তখন রাত নটা। ০৫.০২.২০২৫ রাত ১২.৩০ মিনিট এ আমাদের ফ্লাইট ছিল এয়ার এশিয়া। তবে কাম্বোডিয়ার 'সিয়েম রিপ' (Siem Reap) শহরে যেতে হলে ব্যাংকক এয়ারপোর্ট এ প্রায় পাঁচঘন্টা অতিবাহিত করতে হয়। তাই ব্যাংকক পৌঁছে সেই লম্বা সময়টা এয়ারপোর্টটা ঘুরে দেখলাম, কিছু সেলফি তুললাম।

কাম্বোডিয়ায় প্রথম দিন: স্থানীয় সময় ৯.৪৮ মিনিট এ আমরা পৌঁছলাম কাম্বোডিয়ার 'আঙ্কর ভাট' মন্দিরের জন্য বিখ্যাত 'সিয়েম রিপ' শহরে। বিদেশে ঢোকার জন্য সমস্ত ফরম্যালিটিশ করতে এয়ারপোর্টে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। এয়ারপোর্টের বাইরে আমাদের কাম্বোডিয়ার লোকাল গাইড 'ওয়ান' বন ভয়েজের প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষা করছিল এক সুন্দর লাক্সারি বাস নিয়ে। বাসের ডিকিতে সবার লাগেজ ওঠার পর আমরা রওনা হলাম 'সিয়েম রিপ' শহরের উদ্দেশ্যে।

বাস চলাকালীন গাইড আমাদের কম্বোডিয়ার সমন্ধে অনেক কিছু বর্ণনা দিতে দিতে এক ভারতীয় রেস্তোরাতে লাঞ্চের জন্য নিয়ে গেল। বিদেশে অবশ্য সব ভারতীয় ট্যুর এজেন্টরা লাঞ্চ ও ডিনার টা ভারতীয় রেস্তোরাতেই ব্যবস্থা রাখে আর যে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা সেখানেই এলাহী কম্পলিমেন্টারি ব্রেকফাষ্ট থাকে। লাঞ্চ সারার পর বাসে চলাকালীন আমাদের গাইডের বর্ণনায় জানতে পারলাম 'আঙ্কর ভাট' মন্দিরকে সম্মান জানানোর জন্য এখানে কোনো বিল্ডিং আঙ্কর ভাট মন্দির থেকে উঁচু বানানো হয় না । তাই কোনো গগনচুম্বী অট্টালিকা এই শহরে দেখা গেল না।

অবশেষে আমাদের হোটেল 'দামরেই আঙ্কর হোটেল' এ পৌঁছলাম। হোটেলটা চারতলা। আমার রুম নম্বর ছিল ৪১৬। হোটেলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে দুপুর সাড়ে তিনটের সময় আমাদের বাস চলে আসে এবং আমরা বেড়িয়ে পড়লাম স্থানীয় কিছু বিখ্যাত মন্দির, প্যাগোডা ও বাজার দেখতে। প্রথমে আমরা এখানকার রয়্যাল রেসিডেন্সের চত্বরে যাই। এই চত্বরে রয়্যাল রেসিডেন্স বা প্যালেস ছাড়া রয়েছে রয়্যাল ইন্ডিপেডেন্স গার্ডেন এবং এটি রয়্যাল রেসিডেন্সের কম্পাউন্ডের মধ্যে অবস্থিত যেখানে 1982 সাল থেকে "প্রিয়াহ আং চেক এবং প্রিয়াহ আং চর্মজ" (Preah Ang Chek Preah Ang Chorm) মন্দিরটি রয়েছে। সেটি মূলত দুইবোনের মন্দির।

এরপর আমরা গেলাম "বাট প্রিয়াঃ প্রোম্ রাথ" ('Wat Preah Prom Roath') নামে একটা প্যাগোডা দেখতে। 1500 সালে একজন বুদ্ধ সন্ন্যাসী নৌকায় চড়ে ঘুরে ঘুরে প্রাচীন কাম্বোডিয়ার রাজধানী লঙ ভেক এ ভিক্ষা করতেন। সেটি এখন কাম্বোডিয়ার রাজধানী (নম ফেন) Pnom Penh এর কাছেই অবস্থিত।

এরপর আমরা গেলাম সিয়েম রিপের সবথেকে পুরোনো বাজারে। যার নাম 'সিয়েম রিপ নাইট মারকেট'। এটা ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। এই বাজারে ফল সব্জি থেকে শুরু করে সমস্ত আইটেম বিক্রি হয়। মহিলারা কেনাকাটিতে যখন ব্যস্ত, সেই সুযোগে ছেলেরা গল্প করে সময়টা কাটিয়ে দিলাম। বাজারের উল্টো দিক দিয়ে বয়ে চলেছে সিয়েম রিপ নদী। গাইড এখানে এক ঘন্টা সময় দিয়েছিল। এরপর 'ময়ূরী' নামে এক ভারতীয় রেস্টুরেন্টে ডিনার টা সেরে হোটেলে ঢুকলাম। সকাল হলেই পরের দিনের ট্যুর। তাই কি পরব, সেই সব গুছিয়ে শুভ রাত্রি বলে শুয়ে পড়লাম ।

কাম্বোডিয়ায় দ্বিতীয় দিন: সকালে সাড়ে সাতটায় ব্রেকফাস্ট করেই রওনা দিলাম আমাদের চির আকাঙ্খিত "আঙ্কর ভাট" সহ আরো কিছু মন্দির দর্শন করতে এবং সন্ধ্যের পর যাবো 'অপ্সরা' ডান্স দেখতে। হোটেল থেকে আঙ্কর ভাট মন্দির প্রায় সাত কিমি দুরত্বে। মন্দিরে প্রবেশের জন্য গাইড আমাদের নিয়ে টিকিট কাউন্টারের দিকে গেল যেখানে বিদেশীদের পাসপোর্ট দেখাতে হয় এবং

কাউন্টারে রাখা ক্যামেরার দ্বারা টিকিটের ওপর প্রত্যেকের নিজের ছবি তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়। এই এক টিকিটেই আঙ্কর ভাট ছাড়াও ওই এলাকার আরও অন্য মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। আগ্রহবশত গাইড কে টিকিটের মূল্য জানতে চাওয়াতে উনি বললেন একজনের টিকিটের মূল্য 37 ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় আনুমানিক Rs 3182)।

আঙ্কর ভাট মন্দির চত্বর, যেটি বিশ্বের বৃহত্তম ধর্মীয় সৌধ, প্রায় 400 একর এলাকা জুড়ে। আঙ্কর ভাট মন্দিরের ইতিহাস ও স্থাপত্যের বর্ণনা দিতে গেলে শেষ হবে না। কাম্বোডিয়ান ভাষায় আঙ্কর ভাটের আক্ষরিক অর্থ 'মন্দিরের শহর বা নগর'। এর বিশালতা ও সৌন্দর্য দূর থেকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। দুঘন্টা সময় নিয়ে আমরা শুরু করলাম আমাদের যাত্রা। অনেক ছবি তোলা হল।

বিশাল এলাকা জুড়ে এই আঙ্কর ভাটের মন্দির। তাই সবাই ক্লান্ত। যাইহোক পরের দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য মনটাকে স্থির করলাম। আমাদের পরের দ্রষ্টব্য স্থান হল 'তা প্রোহম' (Ta Prohm) মন্দিরে। তবে এই সময়ের ব্যবধানে আমরা লাঞ্চ পর্ব সেরে নিলাম।

"তা প্রোহম" মন্দির: আঙ্কর ভাট থেকে 'তা প্রোহম' মন্দিরের দুরত্ব মাত্র 3.5 কিলোমিটার। খেম রাজ্যের অবনতির পর ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই মন্দির পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে। মন্দিরটি মর্টার ছাড়া নির্মিত হয়েছিল বলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকাকালীন অনেক গাছপালা পাথরের মধ্যে সহজেই শিকড় গেড়েছিল। এই গাছগুলো মধ্যে দুটি প্রজাতি প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন মত অনুযায়ী হয়ত বড়ো গাছগুলি রেশমতুলার গাছ এবং অপেক্ষাকৃত ছোটোগাছগুলি 'স্ট্যাংলার ডুমুর গাছ'। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই মন্দির রাজবিহার রূপে পরিচিত হলেও বর্তমানে এই মন্দির 'তা প্রোহম'(পূর্ব পুরুষ ব্রহ্মা) নামে পরিচিত।

এই মন্দিরটির জনপ্রিয়তার আর একটি কারণ হলিউড মুভি 'Tom Raider (2001) এর চিত্রগ্রহনের পটভূমি এই মন্দির ছিল। বিখ্যাত হলিউড অভিনেত্রী Angelina Jolie এই মুভিতে অভিনয় করেছিলেন বলে বর্তমানে স্থানীয়দের কাছে এই মন্দির 'Tom Raider' মন্দির বা "Angelina Jolie" মন্দির নামেও বেশি পরিচিত।

এই মন্দিরের প্রবেশ পথে দেখেছিলাম "Archeological Survey of India" (ASI) এর একটা বোর্ড। সেখান থেকে অবগত হলাম যে এই মন্দির সংস্কারের কাজে আমাদের দেশের ASI বেশ কিছু বছর ধরে সাহায্য করছে। মন্দিরের ছাদ হুবহু সেই সময়ের মতো রেখে মেরামত বা পুনরায় construction এর কাজ ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা বিগত প্রায় তিন বছর ধরে করে চলেছে। এখনও অনেক কাজ বাকি।

এখানে ঘন্টা দেড়েক থেকে আমরা 'বেয়ন' মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

বেয়ন মন্দির: বেয়ন মন্দির আঙ্করে নির্মিত রাজা সপ্তম জয়বর্মনের শেষ রাজ্য মন্দির। এটি আঙ্কর থম শহরের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য মেরুপর্বতের আদলে তৈরী এর চূড়াটি বৃত্তাকারে 54টি টাওয়ার এবং 216টি মুখাবয়ব দিয়ে সাজানো। কিছুটা সময় কাটিয়ে আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম কেননা সন্ধ্যায় যাবো অপ্সরা নৃত্য দেখতে। অপ্সরা শব্দের অর্থ হলো স্বর্গীয় জলপরী। হিন্দু মাইথোলজিতে একশ আটটি অপ্সরার উল্লেখ আছে যারা ইন্দ্রপুরীতে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন ছাড়াও ঋষি মুণিদের প্রলুব্ধ করার জন্য বিখ্যাত। এদের মধ্যে মেনকা, ঊর্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা উল্লেখযোগ্য।কাম্বোডিয়ার আঙ্কোরিয়ান মন্দিরের পাথরের ভাস্কর্যগুলিতে অপ্সরা একটি গুরুত্বপূর্ণ মোটিফ।তবে বেশির ভাগ পর্যটক সিয়েম রিপ্ শহরে এসে অপ্সরাদের নৃত্য পরিবেশনা ও কাম্বোডিয়ান রেস্তোরায় রাতের খাবার খেতে পচ্ছন্দ করেন। তাই রেস্তোরাগুলিতে সাধারণত সন্ধে 6:00 টা থেকে 7:00 টায় শুরু হয় রাতের খাবার এই সময়ে শুরু হয় নৃত্য পরিবেশন যা প্রায় 45 থেকে 60 মিনিট পর্যন্ত চলে। বিশেষ করে ব্যস্ত মরসুমে। রেস্তোরায় সেরা আসনের জন্য আগে থেকে রিজার্ভ করতে হয় ।

অপ্সরা নৃত্য: অপ্সরা শব্দের অর্থ হলো স্বর্গীয় জলপরী। হিন্দু মাইথোলজিতে একশ আটটি অপ্সরার উল্লেখ আছে যারা ইন্দ্রপুরীতে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন ছাড়াও ঋষি মুণিদের প্রলুব্ধ করার জন্য বিখ্যাত। এদের মধ্যে মেনকা, ঊর্বশী, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা উল্লেখযোগ্য। 1967 সালে উজ্জ্বল রেশমের পোষাক ও চকচকে রত্ন পাথরে সজ্জিত যুবতী রাজকন্যা রাজকুমারী নরোদম বুপ্পাদেবী যিনি নরোদম সিহানুকের কন্যা তাঁর দাদীর সহায়তায় রাজকীয় ও পিনপিট অর্কেস্ট্রার সাথে প্রাসাদের মধ্যে সর্বপ্রথম অপ্সরা নৃত্য পরিবেশন করেন। এরপর থেকে তিনি অপ্সরা চরিত্রের প্রধান নৃত্যশিল্পী হয়ে বিশ্ব ভ্রমণ করেছিলেন ও অপ্সরা চরিত্রকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করিয়েছিলেন। বর্তমানে স্থানীয় মন্দির গুলিতে অপ্সরা নৃত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে বেশির ভাগ পর্যটক সিয়েম রিপ্ শহরে এসে অপ্সরাদের নৃত্য পরিবেশনা ও কাম্বোডিয়ান রেস্তোরায় রাতের খাবার খেতে পচ্ছন্দ করেন। তাই রেস্তোরাগুলিতে সাধারণত সন্ধে 6:00 টা থেকে 7:00 টায় শুরু হয় রাতের খাবার এই সময়ে শুরু হয় নৃত্য পরিবেশন যা প্রায় 45 থেকে 60 মিনিট পর্যন্ত চলে । রেস্তোরায় সেরা আসনের জন্য আগে থেকে রিজার্ভ করতে হয় বিশেষ করে ব্যস্ত মরসুমে।

আমরা ঠিক ৬.৩০ পৌঁছলাম মোরাকোট এঙকর রেষ্টুরেন্ট এ যেখানে কাম্বোডিয়ান ডিনার ও সঙ্গে অপ্সরা নৃত্য দেখার জন্য যেখানে সন্ধ্যের আসন রিজার্ভ করা হয়েছিল। যখন আমরা পৌঁছলাম রেস্টুরেন্ট তখন গমগম করছে। এখানে প্রায় 600 থেকে 700 বা তারও বেশি অতিথি একসঙ্গে বসে রাতের খাবার খেতে ও নৃত্য অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। হলের একদিকে বিশাল স্টেজ ও অপর দিকে এলাহি খাবারের ব্যবস্থা। মাঝে সারি সারি ডাইনিং টেবল ও চেয়ার দর্শকদের জন্য। খাবারের আইটেম যে কতো রকমের ছিল গুনে শেষ হয় না। আমাদের খাওয়া শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই শুরু হয়ে গেলো অনুষ্ঠান। মঞ্চে একে একে পরিবেশিত হতে লাগল কাম্বোডিয়ান ফোক নৃত্য। এগুলো বেশিরভাগ দৈনন্দিন জীবন ও মার্শাল আর্টকে কেন্দ্র করে। একেবারে শেষে পরিবেশিত হলো বহু প্রতীক্ষিত অপ্সরা নৃত্য। অপূর্ব সুন্দর এক সন্ধ্যে স্মৃতির ঝুলিতে সংগ্রহ করে আমরা হোটেলে ফিরলাম।

আঙ্কোরভাট মন্দির

তা প্রহোম মন্দির

আঙ্কোরভাট মন্দিরে ওঠার সিঁড়ি

রেয়ন মন্দির

সিয়েম রিপ শহরের উপকণ্ঠ

হোটেল দামেরহ

ব্যাংকক ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট

Travel Diary of Slater Mill

Birthplace of American Industrial Revolution

Sajal Kumar Chattopadhyay

The historic façade of Slater Mill along the Blackstone River

Location: Blackstone River Valley National Historical Park, Pawtucket, Rhode Island (RI), United States

How to Visit: Slater Mill is easily accessible from major nearby cities. From New York, you can take the Amtrak train or drive (approximately 3.5–4 hours). From Boston, the capital of the US state of Massachusetts, it's only about 1 hour by car or commuter rail to Providence, the capital of the US state of Rhode Island. From Providence, Pawtucket is just a 15-minute drive.

Introduction: On May 29, 2025, I visited the historic Slater Mill complex. Recognized as a National Historic Landmark, Slater Mill is regarded as the birthplace of the American Industrial Revolution. It was here in 1793 that Samuel Slater established the first successful water-powered cotton spinning mill in the United States, using the Blackstone River to power machinery that changed the course of history. It is the first water-powered cotton spinning mill in America, and the yarn manufacturing was based on Arkwright's cotton spinning system, which included carding, drawing, and spinning machines.

Why Slater Mill Matters: The Slater Mill stands as more than just an old building—it represents the foundation of America's technological strength. The innovations in textile production pioneered here paved the way for the vast industrial growth of the 19th and 20th

centuries, which ultimately contributed to the United States' leadership in science, technology, and manufacturing. An early application of a giant ratchet wheel and pawl mechanism (Photo plate 4) is seen to prevent backspin while harnessing water power into mechanical rotary motion. Today, the site is preserved under the care of the U.S. government, with the Old Slater Mill Association and the National Park Service working together to maintain its legacy.

The Guided Tour Experience: I was warmly welcomed by guides who led me through the mill and the newly established Slater Industrial Archives inside the Visitor Centre (formally opened in 2023).

Displays of spinning frames and early industrial tools inside Slater mill and its complex

Slater Industrial Archives: The archives are located inside the Old Slater Mill Association (OSMA) Visitor Centre, which is situated opposite Slater Mill. OSMA was formed in 1921 to save the 1793 Old Slater Mill from demolition. The function of the Archives is to preserve and provide access to the special collections of the Association. These include company records, rare documents, photographs, slides, graphic, ephemera, maps, blueprints, historic boxed and rolled textile, books, pamphlets, and historic artifacts that tell the story of the foundations of the American Textile Industry and the broader industrial development of the Blackstone River Valley. Each exhibit tells the story of workers, inventors, and entrepreneurs who transformed early America.

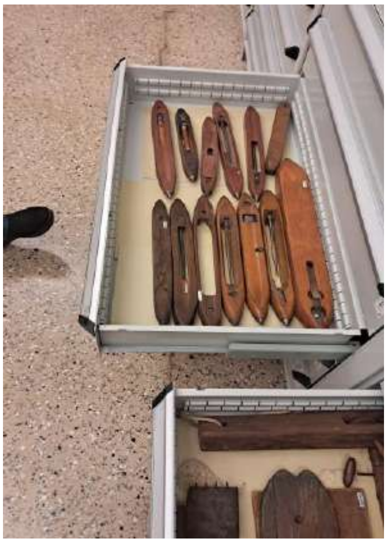

Rare manuscripts, archival documents, textile machine accessories and testing instrument at the Slater Industrial Archives

The World's First Sri Chinmoy Peace-Blossom Bridge: Standing at the south extension of the Slater mill complex and looking downstream along the Blackstone River, one can see the Sri Chinmoy Peace Bridge (Broad Street Bridge). The bridge carries Broad Street across the Blackstone River, connecting Pawtucket/Cumberland with Central Falls (RI). Sri Chinmoy (Chinmoy Kumar Ghose), born on August 27, 1931 in Bengal was an Indian spiritual leader who taught meditation in the US after moving to New York in 1964. Until his passing in 2007, Sri Chinmoy offered his message of peace to all through his prolific creativity in

Literature, music, art and sports. The Sri Chinmoy Peace-Blossom-Bridge is a symbol of unity and peace. Just like a bridge spans a river, a Peace-Bridge stands for bridging differences among human hearts.

Reflections: Visiting Slater Mill felt like walking back into the origins of America's industrial journey. The careful preservation of the site by the U.S. government ensures that future generations can appreciate not only the machinery and buildings, but also the human stories of innovation and perseverance. The guided tours made history come alive, leaving me with a deep sense of respect for the foundation of the technology-driven America we see today.

Author with Tour Guides